আমি সোহানা-২

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯৩

পূর্বাভাস

ছুটিতে পানামায় রয়েছে মাসুদ রানা, সাগরে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলছে। ঘটনাচক্রে দূর থেকে নির্মম একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখল ও। টমাস পেনিফিদারের লোকজন খুন করল জুলি উডহাউসকে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার অন্ধ বোন জেনিকে। পেনিফিদার আর তার দল রানার পুরানো শত্রু। দু'জনকে মেরে তাদের হাত থেকে জেনিকে উদ্ধার করল ও। একটা কটেজে গা-ঢাকা দিয়ে আছে ওরা, ওদের খোঁজে গোটা পানামা চষে ফেলেছে শত্রুরা।

অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত আশরাফ চৌধুরী, অতীন্দ্রিয় রহস্যের একজন গবেষকও বটে; কিন্তু ভীতুর ডিম, খুন-খারাবিকে যেমন ভয় করে তেমনি ঘৃণাও করে—সে তার ফুফাত বোন সোহানা চৌধুরীর কাছে লন্ডনে বেড়াতে এসেছে।

হোয়াইটহলে অফিস, যাবার পথে সোহানার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো, ও তখন প্রফেসর নিগুয়েডার কাছে ফেনসিং শিখছে। ফেনসিং-এ আগেই অবশ্য রানার কাছে হাতেখড়ি নিয়েছে সোহানা। ওদের দু'জনকে ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন মারভিন লংফেলো, বললেন ডিনার শেষে ওদেরকে নিয়ে তিনি তাঁর এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সোহানার প্রশ্নের উত্তরে কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন। কিছুদিন আগে রোমান আমলের যে প্যাপিরাস পাওয়া গেছে, সেটার পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর বন্ধু ড. জিমসন। সেই লিপির সূত্র ধরে আলজিরিয়ার মাস-এ প্রাচীন এক নগর-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, এই মুহূর্তে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালাচ্ছেন প্রফেসর ডেভিড হোয়াইটস্টোন ও তাঁর আর্কিওলজিকাল টীম। মাস-এ সাপ্লাই নিয়ে যায় একটা প্লেন, সেই প্লেনে চিঠি-পত্রও পাঠান প্রফেসর হোয়াইটস্টোন। তাঁর চিঠি পড়ে ড. জিমসনের মনে সন্দেহ হয়েছে, মাসে রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে। তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল নয়, কাজেই তিনি ওখানে যেতে পারছেন না, অনুরোধ করেছেন আসলে কি ঘটছে জানার জন্যে মারভিন লংফেলো যেন কাউকে একবার ওখানে পাঠান। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের বাইরে একটা কনভেনশনে রয়েছেন তিনি, লন্ডনে ফিরে বিস্তারিত সব জানাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে ডিনার শেষে ড. জিমসনের বাড়িতে যাচ্ছে ওরা। গাড়িতে বসেই রেডিওর সাহায্যে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করল সোহানা। সাঙ্কেতিক আরবী ভাষায় একটা মেসেজ দিল রানা। অন্ধ জেনিকে পানামা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, সোহানার সাহায্য দরকার ওর।

ড. জিমসনের বাড়ির সামনে অতিকায় এক কুৎসিত প্রাণীকে দেখল ওরা, আকৃতিতে মানুষ হলেও দৈত্য বলে ভ্রম হয়। ড. জিমসনের কলিংবেল বাজাচ্ছিল সে। জানাল, ইতিমধ্যে চারবার বেল বাজিয়েও ড. জিমসনের সাড়া পায়নি। সময়ের অভাব, কাজেই চলে যাচ্ছে সে। মারভিন লংফেলোর প্রশ্নের উত্তরে সহাস্যে নিজের পরিচয়টা জানিয়ে গেল, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডান কেগান।

বাড়ির ভেতর ঢুকে ড. জিমসনকে সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ঘাড় ভাঙা, মারা গেছেন। মারভিন লংফেলোকে পরামর্শ দিল সোহানা, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একবার খবর নিয়ে দেখা দরকার ডান কেগান নামে ওখানে কেউ আছে কিনা। ইতিমধ্যে প্রশ্ন করে সোহানা জেনে নিয়েছে, মাস প্রজেক্টের সমস্ত খরচ বহন করছেন একজন স্যার, স্যার ভিক্টর ক্যানিং। ভদ্রলোক জনহিতকর বহু কাজের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু আত্মপ্রচার একেবারেই পছন্দ করেন না।

ওদিকে হঠাৎ রানা টের পেল, কটেজটা ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা। শত্রুদের বোকা বানাবার জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করল ও। জেনিকে কটেজে একা রেখে গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে, ওকে ধাওয়া করল শত্রুরা। খানিক পর কটেজে পৌঁছুল সোহানা, জেনিকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিল হোটেল সান্তা মারিয়ায়, আশরাফ চৌধুরীর কাছে। শত্রুদের বোকা বানাবার জন্যে সে-ও পানামা পুলিসের ক্যাপ্টেন হার্মিটেজের সাহায্য নিয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানার আর পালানো হলো না, শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে গেল। প্রায় খালি একটা হোটেলে নিয়ে এসে বন্দী করা হলো ওকে। জেরার উত্তরে প্রায় সব কথাই সত্যি বলল রানা, পেনিফিদার উপলব্ধি করল জেনিকে তারা অনায়াসে ধরতে পারবে, কাজেই রানা ও সোহানাকে তাদের আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। রানার এক হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল তারা, অপর হাতে ধরিয়ে দিল একটা গ্রেনেড, পিনটা জড়ানো থাকল সরু একটা তারের সঙ্গে, তারের অপর প্রান্তটা থাকল দরজার কী-হোলে আটকানো। লম্বা করা হাতটা, যেটায় বোমা রয়েছে, কয়েক ইঞ্চির বেশি নাড়াতে পারবে না রানা, কারণ তাহলে গ্রেনেডের পিনটা বেরিয়ে আসবে। আবার বোমাটা এভাবে বেশিক্ষণ ধরে রাখাও সম্ভব নয়। ওদিকে সোহানাকে ফোন করে হোটেলে ডাকা হয়েছে, বলা হয়েছে এখানে এলে রানার সঙ্গে তার দেখা হবে। সোহানা আসবে, আর সে এলেই নিকেল তাকে সাবমেশিনগান দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে।

অসমসাহস ও তুলনাহীন দক্ষতার সাহায্যে নিকেলের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল সোহানা। তারপরও ওর বা রানার বাঁচার কথা নয়, কারণ ওদের দু'জনের জন্যে আরও একটা মৃত্যু-ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছা ওদেরকে সাহস ও বুদ্ধি যোগাল, দ্বিতীয় ফাঁদটাও এড়িয়ে গেল ওরা।

ইংল্যান্ডের এক গ্রামে, সোহানার বিশাল ভিলায় নিরাপদে রয়েছে জেনি। আশরাফের সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ভিলার সামনে সোহানা একটা পুকুর কাটবে, এ-প্রসঙ্গে আলোচনার সময় জেনির অদ্ভুত একটা গুণের কথা

জানতে পারল ওরা। এক টুকরো লোহার তার হাতে থাকলে মাটির তলায় পানির পাইপ, গ্যাস লাইন, ইলেকট্রিক লাইন অথবা সোনা-রূপা ইত্যাদি কোথায় কি আছে বলে দিতে পারে সে। ওরা ধারণা করল, জেনির এই গুণটির জন্যেই সম্ভবত পেনিফিদার তাকে ধরতে চাইছে। ঘটনাচক্রে মারভিন লংফেলোর বর্ণনা থেকে তৈরি করা ডান কেগান-এর একটা আইডেনটিকিট ছবি দেখল রানা, দেখেই চমকে উঠল। ইতিমধ্যে মারভিন লংফেলো খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, ডান কেগান বলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কেউ নেই। ছবিটা দেখে রানা হঠাৎ যেন হতভম্ব হয়ে গেল। রীতিমত আতঙ্কিত দেখাল ওকে। সোহানার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, দশ বছর আগে এই লোকটাকে চিনত সে। জীবনে যদি কাউকে কোনদিন ভয় করে থাকে ও, তো সে এই লোকটাকে। তার সঙ্গে লড়েওছিল রানা, তবে দাঁড়াতে পারেনি। সেদিন মারাই যেত ও, বেঁচে গেছে ভাগ্যগুণে। লোকটা যে শুধু প্রকাণ্ড তা নয়, তার মত নিষ্ঠুর মানুষ জীবনে কখনও দেখেনি রানা। দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না সে। তার বৈশিষ্ট্য হলো, হাসতে হাসতে মানুষকে মেরে ফেলে। নাম, পাইথন মার্কাস। রানা কাউকে ভয় পায়, কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সোহানা।

এরপর ফ্রান্স থেকে খবর এল, পেনিফিদারকে ওখানে দেখা গেছে। সোহানাকে নিয়ে ফ্রান্সে চলে এল রানা। ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে আশরাফকে আহত করে জেনিকে কিডন্যাপ করল পাইথন। ফ্রান্সে পৌঁছে রানা জানতে পারল, জেনিকে একা পাওয়ার জন্যেই মিথ্যে তথ্য যোগান দিয়ে ওদেরকে ইংল্যান্ড থেকে বের করে এনেছে পেনিফিদার।

রানা ও সোহানা এখনও জানে না, জেনিকে পাইথন কিডন্যাপ করেছে। পেনিফিদার ও পাইথন যে একই দলের লোক, এই প্রথম ওরা জানতে পারবে। ওদের প্রথম কাজ জেনিকে উদ্ধার করা, তারপর অপরাধী চক্রটিকে শায়েস্তা করা। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কিভাবে কতটুকু কি করতে পারে।

এক

লন্ডন। সোহানার পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন হাইড পার্কের দিকে।

'মাত্র দু'মাইল দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে পোস্টাপিসের ভ্যানটা,' বললেন তিনি। 'স্থানীয় পুলিস জেনির ব্যাপারটা জানে না। সাংবাদিকরা ঝামেলা করবে ভেবে ওদেরকে আমি তার কথা কিছু বলিনি। ড্রাইভারকে আহত করে ভ্যানটা যে বা যারা চুরি করেছিল, ওরা শুধু তাকে বা তাদেরকে খুঁজছে। তবে লন্ডন পুলিসের পিক জনসন তার লোকজনকে পাইথন আর জেনিকে খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'আমার ধারণা, ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছে তারা। আনঅফিশিয়ালি, বাই এয়ার। কাজটা যদি আপনারা পারেন, তারাও পারবে।'

ভাঁজ করা হাত দিয়ে কনুই দুটো ধরে কামরার ভেতর নিঃশব্দে পায়চারি করছে রানা। বড় একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে সোহানা, রাগে লালচে হয়ে আছে মুখ। মাত্র দশ মিনিট আগে ফিরে এসেছে ওরা, ভ্রমণের ধকলটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

লম্বা একটা কাউচে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে রয়েছে আশরাফ। তার মুখের একপাশে, চুলের ঠিক নিচে, একটুকরো প্লাস্টার। মেঝের দিকে চোখ, তবে কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। হাতে সিগারেটের খালি প্যাকেট, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে। স্বভাবসুলভ হাসিখুশি ভাবটা কে যেন কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। চেহারা হয়েছে ভূতের মত।

'কাগজে যাতে লেখালেখি শুরু না হয়, তার ব্যবস্থা কি করা সম্ভব, মি. লংফেলো?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভব। পিক জনসনকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি।' জানালার দিকে পিছন ফিরলেন বিএসএস চীফ। 'মি. আশরাফের ফোন পেয়েই তার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি। ভাবলাম, আপনাদের সঙ্গে আলাপ না হওয়া পর্যন্ত সব চেপে যাওয়াই ভাল।'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো।'

আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। 'নিজেকে শান্ত করো, আশরাফ। তুমি অন্তত বেঁচে তো আছ। বুঝতে পারছি না, পাইথন তোমাকে খুন করল না কেন!'

'করলেই ভাল হত,' বিড়বিড় করে বলল আশরাফ। 'সে বোধহয় ধরে নিয়েছিল আমি মারা গেছি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি, গ্যাস স্টোভের গায়ে একটা স্তূপের মত পড়ে আছি, সারা মুখে রক্ত, ঘাড়টা অদ্ভুতভাবে বাঁকা হয়ে দেয়ালে

ঠেকে আছে। প্রথমে মনে হলো, ওটা বোধহয় ভেঙে গেছে। হয়তো পাইথনও তাই ভেবেছিল।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। তারপর কি হলো?'

'একবার তো বলেছি সব।' সোহানার দিকে তাকাল না আশরাফ।

'তবু আরেকবার বলো।'

চোখ বুজল আশরাফ। 'জ্ঞান ফিরল। দেয়াল ধরে দাঁড়ালাম। মাথাটা ফাঁকা লাগছিল, কিছু ভাবতে পারছিলাম না। তোমার দেয়া নাম্বারে ডায়াল করে মি. লংফেলোকে বললাম সব। তিনি বললেন, পুলিস এলে আমি যেন জেনির কথা কিছু না বলি তাদের, ওদিকটা তিনি সামলাবেন, তোমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করবেন। আরও বললেন, আমার জন্যে একটা গাড়ি পাঠাবেন, লোকাল পুলিস আমাকে যাতে বেশিক্ষণ আটকে না রাখে সে-ব্যবস্থাও করবেন। এর দু'মিনিট পর বেনিলডন থেকে দু'জন পুলিস এল, পুলিস স্টেশনের অ্যালার্ম শুনে। আমার কথারও ওরা বোধহয় কোন অর্থ করতে পারেনি, হয়তো ধরে নিয়েছিল আমি পাগল-টাগল হয়ে গেছি। নিজেকে আমার মনেও হচ্ছিল তাই। তারপর কি ঘটেছে আমার ঠিক মনে নেই। দেখলাম পুলিস স্টেশনে বসে আছি, একজন ডাক্তার পরীক্ষা করছে আমাকে। একটু পর মি. লংফেলোর এক লোক গাড়ি নিয়ে পৌঁছুল আমাকে এখানে আনার জন্যে।'

সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ছিল আশরাফ, হাত দুটো কাঁপছে দেখে বগলের নিচে ভাঁজ করল ওগুলো। 'আমি দুঃখিত,' রানার দিকে ফিরে বলল সে। 'জীবনে এই প্রথম আমি বুঝতে পেরেছি, সাহস ও যোগ্যতা না থাকলে একজন পুরুষ মানুষের বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমার হাত থেকে জেনিকে কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা, সেজন্যে নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

আশরাফের সামনে এসে পায়চারি থামাল রানা, তার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ তুমি, আশরাফ। তুমি যা করেছ, তোমার জায়গায় আমি হলেও ঠিক তাই করতাম। জেনিকে তুমি পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ, নিজে পালাওনি। জেনি কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করেছ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়েছ পাইথনের। এ যে কি ভীষণ সাহসের কাজ, ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নিজেকে নিয়ে তোমার গর্ব হওয়া উচিত,' আশরাফ।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল ও। 'ইস্পাতের স্ক্রীনটা যখন লাগাই আমি, পাইথনের মত কারও কথা ভাবিনি।'

'কেউ ভাবত না,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'ওরকম শক্ত একটা তারের জাল খালি হাতে কেউ ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কল্পনার বাইরে। আই সাজেস্ট এভরিবডি স্টপস ফিলিং গিল্টি। আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না যে একটাই দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করছে—পানামায় আপনার সঙ্গে বেধেছে পেনিকিদার আর ক্রনেলের, এখানে আমাদের সঙ্গে বেধেছে পাইথনের।'

'পাইপ,' বলল রানা, হাতের তালু দিয়ে চাপ দিল কপালে। 'ওহ্ গড, পাইপ!'

মারভিন লংফেলো তাকিয়ে থাকলেন। মুখ তুলে তাকাল আশরাফও, চোখে

নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। সোহানা জানতে চাইল, 'কি বলছ, রানা?'

সোহানার দিকে তাকাল রানা, কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল গলাটা, 'আমি একটা ভুল করেছি। কাল রাতে তুমি যখন বললে প্রথমে আমরা পেনিফিদারকে শায়েস্তা করব, তারপর ধরব পাইথনকে, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, দুটো বিষয়ের মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ আছে। জানতাম, কি যেন মিলছে না।' আবার পায়চারি শুরু করল রানা। 'আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি। পেনিফিদার আর ব্রুনেল পানামায় আমাকে জেরা করেছিল, এক ফাঁকে নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে যেন আলাপ করল ওরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জেনিকে তাদের কেন দরকার। পেনিফিদার বলল, দরকার আর্কিওলজিকাল রিসার্চের জন্যে। আমি ভাবলাম, কৌতুক করছে সে।'

আশরাফ ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু ঠিক বুঝলাম না···।'

'পরিষ্কার,' বলল রানা। 'জেনি শুধু পাইপ নয়, দামী মেটালও খুঁজে বের করতে পারে। কাল আমি জানতে পারি, সেজন্যেই জেনিকে ধরতে চাইছে পেনিফিদার, ওকে দিয়ে মাটির তলায় পড়ে থাকা কিছু বের করবে। কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সোহানা যখন আমাকে বলল যে মাসে কি ঘটছে না ঘটছে সে-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন ড. জিমসন। ড. জিমসনের সন্দেহ হয়, সেজন্যেই তাঁকে খুন করে পাইথন। দুটো ঘটনাই আমি জানতাম, অথচ মেলাতে পারিনি। মাস-এ কিছু একটা আছে, পেনিফিদার আর পাইথন সেটা পেতে চাইছে। শুধু জেনি সাহায্য করলে জিনিসটা তারা পেতে পারে।'

'যোগাযোগটা ক্ষীণ, মি. রানা,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মারভিন লংফেলো। 'তৃতীয় নয়ন ছাড়া দেখতে পাবার কথা নয়।'

'যার তা নেই তার এ-পেশায় থাকা উচিত নয়,' বলল রানা, আত্মসমালোচনায় নির্দয়। মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল ও। 'স্যার ক্যানিং-এর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার, কত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব বলে মনে করেন?'

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল আশরাফ, প্রসঙ্গটা ঠিক ধরতে পারছে না। তারপর তার মনে পড়ল, মাসে যে খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে তার যাবতীয় খরচ বহন করছেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং।

বিএসএস চীফ ইতস্তত করছেন। 'ঠিক কি ভাবছেন বলুন তো, মি. রানা?'

'মাস আলজিরিয়ান এলাকা। আলজিরিয়ান সরকারের অনুমতি আদায় করা অত্যন্ত কঠিন ও ঝামেলার কাজ। আমি আর সোহানা ক্যারাভান রুট ধরে যেতে পারি, কিন্তু তাতে সময় অনেক বেশি লাগবে। আলজিয়ার্স-এ স্যার ক্যানিঙের একটা প্লেন আছে, সাপ্লাই নিয়ে আসা-যাওয়া করার অফিশিয়াল অনুমতিও আছে তাঁর। সেজন্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।'

পরবর্তী দু'মিনিট আবছাভাবে ওদের আলাপ শুনল আশরাফ, তার ভেতর একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ফুটে উঠল। হঠাৎ বলল সে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

রানার প্রশ্নের উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সোহানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল

আশরাফের দিকে। 'তুমি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নও, আশরাফ। তাছাড়া···'

'কে বলল আমি সুস্থ নই? আমার মন খারাপ, সেটাকে তুমি অসুস্থতা বলতে পারো না। আমি এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এ হতে পারে না। পাইথন যখন জেনিকে ধরল, জেনি চিৎকার করে উঠেছিল। তার সেই চিৎকার এখনও আমি শুনতে পাচ্ছি।' হাত তুলে চোখ দুটোয় চাপা দিল সে। 'তার জগৎটা এরকম,' ধরা গলায় বলল সে, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। 'অন্ধকার। সব সময় অন্ধকার। ভয় পাওয়া কাকে বলে আমি জানি, কিন্তু এক শুধু আল্লাই বলতে পারবে তার মনের কি অবস্থা!'

রানার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সোহানা। কথা না বলে মাথাটা নিচু করল রানা।

ওদের হাবভাব লক্ষ করল আশরাফ, রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লীজ, রানা, আমাকে তোমরা সঙ্গে নাও। এখানে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।' ভৌতিক হাসি ফুটল তার মুখে। 'আমাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না, কথা দিচ্ছি। বিশ্বাস করো, ভয়ে আমি জ্ঞান হারাব না। ভয় বলে সত্যি আর কিছু নেই আমার ভেতর। আমি আর পরোয়া করি না। এমনকি পাইথন আমাকে শুধু ঝাঁকি দিয়ে মেরে ফেলতে পারে, এ-কথা ভেবেও আমার ভয় লাগছে না। এমন হতে পারে, পাইথন যখন আমাকে মারার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তোমরা হয়তো তাকে গুলি করার একটা সুযোগ পাবে।'

তার কথায় কেউ হাসল না। কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। সবাই তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর গম্ভীর সুরে রানা বলল, 'আমরা জেনেশুনে বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। এ পরিস্থিতিতে আনাড়ি কাউকে সঙ্গে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে তোমার ব্যাপারটা আলাদা, আশরাফ। আমি তোমার মধ্যে সত্যিকার সাহসী একজন পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি। জেনিকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সে যখন তোমার দায়িত্বে ছিল, কাজেই তাকে উদ্ধার করতে যেতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।'

বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো তাঁর সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে স্যার ভিক্টর ক্যানিং-এর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের আয়োজন করতে সমর্থ হলেন। শহরের অভিজাত এলাকায় মার্বেল পাথরের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ক্যানিং হাউসে ঠিক ছ'টায় সময় ওদের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করতে রাজি হয়েছেন ভদ্রলোক।

স্যার ক্যানিং শুধু যে বিশাল সব কোম্পানির মালিক তা নয়, বিশটার মত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষকও তিনি, বারোটা হাসপাতালের গভর্নিংবডির সদস্যও। কোন কাজেই তিনি কম মনোযোগী নন। প্রতিটি দায়িত্ব সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেন ভদ্রলোক। কাজেই তিনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ হবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

অল্প বয়সে ব্যবসায় ঢোকেন স্যার ক্যানিং, পঁচিশ পেরোবার আগেই প্রথম

এক মিলিয়ন পাউন্ড কামিয়ে ফেলেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দূরদৃষ্টি তাঁর অন্যতম গুণ, যার ফলে ব্যবসাতে শনৈ শনৈ শুধু তাঁর উন্নতিই ঘটেছে। স্যার ক্যানিং একজন মৌন বা বোবা ধনকুবের। পত্র-পত্রিকায় কখনও তিনি সাক্ষাৎকার দেন না বা টিভির পর্দায় আসেন না। শোনা যায়, কোন রাজনৈতিক দলকেই চাঁদা দেন না তিনি, ফলে রাজনীতির ব্যাপারে তাঁকে নিরপেক্ষ বলে মনে করা হয়।

এখন তাঁর বয়েস পঞ্চান্ন, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পনেরো বছর হলো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। নিঃসন্তান তিনি। প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী, খুব কম মদ্য পান করেন, মাঝে মধ্যে ব্রিজ খেলেন, এবং যতটুকু জানা যায় নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কোন দুর্নাম নেই। তাঁর একমাত্র শখ হলো অর্কিড চাষ। রিভেয়েরায় তাঁর একটা ভিলা আছে, গরমের দিনে সেখানে তিনি হপ্তা কয়েক কাটান, তবে অতিথিদের সেখানে কখনও অ্যাপায়ন করেন না। ভদ্রলোক গলফ খেলেন না, ব্যায়ামের জন্যে হাঁটেন ও সাঁতরান।

মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড একটা ডেস্কে মাত্র কয়েকটা জিনিস রয়েছে—ছোট একটা মেমো-প্যাড, বড় একটা ডেস্ক ডায়েরী, দুটো টেলিফোন, একটা ইন্টারকম। গভীর একটা স্যুইভেল চেয়ারে বসে আছেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং, হেলান দিয়ে আছেন পিছনে, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। তাঁর শরীরটা বিশাল, মাথার চুল নিখুঁতভাবে ব্যাকব্রাশ করা, কপালের দু'পাশে পাক ধরেছে। বয়স হলেও আশ্চর্য মসৃণ তাঁর চেহারা, এখনও কোন ভাঁজ বা রেখা পড়েনি।

ঝাড়া প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলছেন মারভিন লংফেলো, একবারও তাঁকে বাধা দেননি স্যার ক্যানিং।

মারভিন লংফেলোর পাশে বসে আছে রানা, পরনে ধূসর রঙের কমপ্লিট স্যুট। মাঝে মধ্যে ওর দিকে তাকাচ্ছেন স্যার ক্যানিং, তবে বেশিরভাগ সময় লক্ষ করছেন বিএসএস চীফকে। তাঁর চোখ দুটোয় আশ্চর্য একটা গভীরতা ও জাদু আছে, যেন মনে হয় খুঁটিয়ে দেখার জন্যে তিনি ওই চোখ দুটোর সাহায্যে নিজের ভেতর টেনে নেন প্রতিপক্ষকে। শিল্প ও বাণিজ্যের কুটিল জগতে চলার পথে সঙ্কট কখনও তাঁর পিছু ছাড়েনি, কিন্তু চোখ দুটো সাক্ষ্য দেয় সঙ্কট যতই তীব্র হোক, কখনও বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে। মারভিন লংফেলোর গল্প তাঁর যদি অবিশ্বাস্য লেগেও থাকে, চেহারায় তার কোন আভাস ফুটল না। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনছেন তিনি, গেঁথে রাখছেন অন্তরে, বিশ্লেষণ করছেন দ্রুত।

বিএসএস চীফ থামতেই প্রথম প্রশ্নটা করার জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন স্যার ক্যানিং। রানার মনে হলো, ওই শান্ত চোখের পিছনে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো এরইমধ্যে সাজানো হয়ে গেছে।

'আপনার এই ধারণা কতটা যুক্তিসিদ্ধ, মি. লংফেলো?' অত্যন্ত মার্জিত কণ্ঠস্বর, উচ্চারণও বিশুদ্ধ। কোমল বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।

মারভিন লংফেলো সরাসরি জবাব দিলেন, 'আমার কোন সন্দেহ নেই যে মাসে খারাপ কিছু একটা ঘটছে, এবং মেয়েটাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন স্যার ক্যানিং। 'নতুন করে ঢেলে সাজানো ব্রিটিশ সিক্রেট

সার্ভিসে আপনার অবদান সম্পর্কে খবর রাখি আমি। খবর রাখার কথা নয় আমার, তবু রাখি। কাজেই এ-ব্যাপারে আপনার বক্তব্য আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আপনার কি ধারণা, এই ক্রিমিন্যালরা মাস দখল করে নিয়েছে?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে আপনি সন্দেহ করেন? সম্ভব, ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে?'

'অসম্ভব বলেই মনে হয়। এ-কথা বলছি তাঁর সুখ্যাতির কথা মনে রেখে। বন্ধু-বান্ধবের কাছে তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিরীহ হিসেবে পরিচিত।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন স্যার ক্যানিং। 'তার রিপোর্টে সঙ্কটের কোন আভাসই আমি পাইনি।'

'রিপোর্টে কিছু থাকবে না, যদি পেনিফিদার ও পাইথন জায়গাটা দখল করে নিয়ে থাকে,' খানিকটা শুকনো লাগল মারভিন লংফেলোর গলা। 'তবে, ড. জিমসন তাঁর চিঠি পড়ে কিছু একটা সন্দেহ করেছিলেন।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন স্যার ক্যানিং। 'হোয়াইটস্টোনকে আমার চেয়ে ভালভাবে চিনত সে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আমাদের সামনে তিনটে বিকল্প পথ আছে। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে আলজিরিয়ান সরকারকে অনুরোধ, ব্যাপারটা যেন তদন্ত করে দেখা হয়। একই উদ্দেশ্যে আমার তরফ থেকে আলজিরিয়ান সরকারকে অনুরোধ। কিংবা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করা।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবেন বিএসএস চীফ, সবিনয় ভদ্রতার সঙ্গে একটা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন স্যার ক্যানিং। 'প্রথমটা বাতিল হয়ে যায়, কারণ দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিকল্পটা সম্ভব। হোয়াইটস্টোনকে আর তার টীমকে ফান্ড দেয়ার আগে প্রথমে আমাকে খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে আলজিরিয়ান সরকারের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়েছে। ওরা একটা নতুন মিউজিয়াম তৈরি করবে, সেজন্যে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছি আমি। বলা যায়, ওদের ওপর ব্যক্তিগত খানিকটা প্রভাব আমার আছে। তবে আলজিরিয়ান সরকার তদন্ত শেষ করতে সময় নেবে অনেক বেশি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে মেয়েটাকে আমরা হয়তো বাঁচাতে পারব না। আর শুধু মেয়েটিই নয়, বিপদের মধ্যে রয়েছে হোয়াইটস্টোন ও তার টীমও।'

রানার দিকে তাকালেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং। ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'এর আগে বলেছি, মি. লংফেলো সম্পর্কে খবর রাখি আমি,' বলে চলেছেন ভদ্রলোক। 'আমি আপনার সম্পর্কেও কিছু কিছু খবর রাখি, মি. মাসুদ রানা। যদি কিছু মনে না করেন, এটা তো অবভিয়াস যে বাংলাদেশ গভীর সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে, বিস্তারিত বিবরণ না-ই বা দিলাম—কিন্তু তবু ভাবতে ভাল লাগে যে বাংলাদেশেরও গর্ব করার মত অনেক কিছু আছে—যেমন বিসিআই, যেমন রানা এজেন্সি। আমার ধারণা দক্ষ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বিনিময়ে বাংলাদেশ ভাল

ফরেন কারেন্সি আয় করছে। সম্ভবত ব্রিটেন থেকেও।'

জবাব দিলেন মারভিন লংফেলো। 'মি. রানা ও মিস সোহানা আসলে বিএসএস-এর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। এর মধ্যে টাকা-পয়সার কোন ব্যাপার নেই। টপ সিক্রেট ব্যাপার, তবু বলি—আমাদের অনেক কাজ করতে গিয়ে ওদেরকে বহুবার মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয়েছে।'

'ব্রিটেনের একজন নাগরিক হিসেবে ওঁদের প্রতি সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' সবিনয়ে বললেন স্যার ক্যানিং। 'তবে একটা কথা না বলে পারি না—বুদ্ধি ও চাতুর্যের অমার্জনীয় অভাব না ঘটলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এভাবে ধসে পড়ত না। নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব যদি আমার ওপর থাকত, পরিস্থিতি তাহলে অন্যরকম হত। থাক এ-প্রসঙ্গ। আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, মি. রানা?'

'আপনার পাইলটকে বলুন, পরবর্তী রেগুলার ফ্লাইটে সে যেন দু'জন আরোহীকে নিয়ে যায় ওখানে। সরি··· তিনজনকে।'

'আপনি, মিস সোহানা, আর···কি যেন নাম ভদ্রলোকের? আশরাফ চৌধুরী। হ্যাঁ।' ডেস্ক ডায়েরী খুলে পাতা ওল্টালেন স্যার ক্যানিং। 'পরবর্তী রেগুলার ফ্লাইট আলজিয়ার্স থেকে মাসে যাবে বৃহস্পতিবার, মানে পরশুদিন।'

'তাহলে বৃহস্পতিবারেই যাব আমরা। আলজিয়ার্স গিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?'

'আমার এজেন্টের সঙ্গে। আমি একটা সাদা কাগজ সই করে দেব আপনাকে, তাকে দিয়ে যা যা করাতে চান অর্থাৎ নির্দেশগুলো লিখে নেবেন আপনি। আজ রাতে তাকে আমি ফোন করেও যা বলার বলে দেব। পাইলটকে আপনার হাতে তুলে দেবে সে।'

'ওরা দু'জনেই মুখ বন্ধ রাখবে তো?'

'অবশ্যই। বাছাই করা লোক ছাড়া রাখি না আমি, বাছাই করি আমি নিজে। তাছাড়া, পরবর্তী ফ্লাইটেই যাচ্ছেন যখন, আপনারা মাসে পৌঁছবার আগে কারও পক্ষে ওখানে কোন মেসেজ পাঠানো সম্ভব নয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, সন্তুষ্টবোধ করছে। 'পাইলট অভিজ্ঞ তো?' জানতে চাইল ও।

'ইউরোপ ও স্টেটস-এর সেরা ছ'জন পাইলটের একজন বলে মনে করি আমি তাকে।'

'ভালই হলো তাহলে। আমি চাইব সে যেন আমাদেরকে মাস থেকে দশ মাইল দূরে কোথাও নামিয়ে দেয়, তারপর আবার নিজের পথে রওনা হয়ে ভুলে যায় আমাদের কথা।'

ভুরু দুটো উঁচু করলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'ওই এলাকায় সে-সুযোগ কি আছে?'

'আছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'সাহারার মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ বালিয়াড়ি। পাহাড়, সমতল জমিন অনেক পাওয়া যাবে। তবে তাকে আমি ব্যাপারটা জানাব সময়মত। তার মধ্যে যদি দিধা দেখি, আমরা প্যারাশুট ব্যবহার করব। কারও চোখে না পড়ে মাসে পৌঁছুতে হবে আমাদের। আগে জানতে হবে ঠিক কি ঘটছে

ওখানে।'

স্যার ক্যানিঙের চোখে কৌতূহল, রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মারভিন লংফেলোর দিকে তাকালেন তিনি। 'এ-ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

সতর্ক হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর মুখে। 'মি. রানাকে তার কাজ সম্পর্কে আমি কোন পরামর্শ দিতে রাজি নই।'

রানার দিকে তাকালেন স্যার ক্যানিং। 'সে-চেষ্টা আমিও করছি না। এক্সকিউজ মি ফর আ মোমেন্ট।' একটা দেরাজ খুলে ডাই-স্ট্যাম্পড কাগজ বের করলেন তিনি। সোনালি কলম দিয়ে প্রায় ষাট সেকেন্ড দ্রুত লিখলেন কাগজটায়। 'এখানে আলজিয়ার্সে আমার এজেন্টের ঠিকানা থাকল, সেই সঙ্গে নেসেসারি অথোরাইজেশন।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এলেন রানার হাতে ওটা ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। 'চলবে তো?'

লেখাটা দ্রুত পড়ল রানা। স্পষ্ট হস্তাক্ষর, পরিচ্ছন্ন। 'হ্যাঁ, সব দিক কাভার করছে। ধন্যবাদ, স্যার ক্যানিং।'

'কবে নাগাদ আপনার কাছ থেকে খবর পাব আমরা, মি. রানা?'

'রিপোর্ট করার মত কিছু পেলেই আমরা আপনাকে জানাব। মি. লংফেলোর কমিউনিকেশন রূমের সঙ্গে আমাদের একটা রেডিও লিঙ্ক থাকবে।'

'কিন্তু তা তো সম্ভব নয়,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন স্যার ক্যানিং। 'ওরা আমাকে জানিয়েছে মাস হল ডেড এরিয়া, মানেটা যা-ই হোক। পাহাড় আর তাদেমিট মালভূমির সঙ্গে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। সেজন্যেই তো হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে আমার কোন রেডিও লিঙ্ক নেই। আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে চিঠি পত্রের ওপর।''

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধীর পায়ে জানালার দিকে এগোলেন তিনি। 'আপনি হয়তো তিন বা চারটে রেডিও লিঙ্ক ব্যবহার করে সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন—এ-সব আমি ভাল বুঝি না।'

'না।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। 'সেটা অত্যন্ত জটিল।' মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গে একমত হলেন মারভিন লংফেলো।

স্যার ক্যানিং বললেন, 'তাতে অবশ্য তেমন কিছু এসে যাবে না, শুধু এদিকে আমরা কিছু জানতে না পারায় টেনশনে থাকব। আপনারা যদি সাহায্য চেয়ে মেসেজ পাঠান, আমাদের তরফ থেকে তেমন কিছু করার থাকবে না। আলজিরিয়ার মাটিতে থাকবেন আপনারা, আমি বললে হয়তো ওদের সরকার সাহায্য পাঠাতে রাজি হবে, কিন্তু ভাবতেও ভয় লাগে কি রকম সময় নেবে ওরা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বিএসএস চীফ। স্যার ক্যানিং ঠিকই বলেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটার সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত ভাল-মন্দ কিছুই জানতে পারবেন না তিনিও।

'তিন হপ্তা সময় দিন আমাকে,' বলল রানা। 'জানি, লম্বা সময় চাইছি। কিন্তু মাসও আধুনিক সভ্য জগত থেকে অনেক দূরে। ওখানে গিয়ে কি দেখব এখনও আমরা জানি না। আপনি শুধু দেখবেন, প্লেনটা যেন রেগুলার ফ্লাইট মিস না

করে।'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর স্যার ক্যানিং জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তিন হপ্তার ভেতর আপনার কাছ থেকে যদি কোন খবর না পাই?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'সেক্ষেত্রে ধরে নেবেন, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করে আপনাদের দু'জনের ওপর। তবে যা-ই করুন না কেন, তাতে আমাদের কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না।'

'বোধহয় উপকার হবে,' শান্ত গলায় বললেন স্যার ক্যানিং। 'তিন হপ্তার ভেতর আপনার কাছ থেকে কোন মেসেজ না পেলে আমি নিজে মাসে চলে যাব। আমার সঙ্গে দু'একজন আলজিরিয়ান মন্ত্রী থাকবেন, থাকবে একজন এসকর্ট। তবে, আশা করব, তার দরকার হবে না।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'সিনসিয়ারলি আশা করব, ব্যাপারটা অতদূর গড়াবে না।'

দুই

প্লেনটা সেসনা স্কাইওয়াগন, ৩০০ ঘোড়া কন্টিনেন্টাল ১০-৫২০ এঞ্জিন। মাল-পত্র তোলা ও নামানোর জন্যে দু'পাশেই একটা করে বড় দরজা আছে। পানির ড্রামগুলোকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে দুটো বাদে বাকি সব সিট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রতিটি ড্রামে ত্রিশ গ্যালন করে পানি থাকে। হপ্তায় দু'বার মাসে যায় সেসনা।

প্লেনের ডেকে দুটো বড় সুটকেস তুলল রানা। চার ড্রাম পানি ও খাবার ভর্তি একটা কাঠের বড় বাক্স আগেই তোলা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে তিনজন আরোহী উঠলে সেসনার ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবে, তবে সেটা উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু নয়।

এয়ারফিল্ডের গরম টারমাক ধরে হেঁটে এল সোহানা, পিছনেই রয়েছে আশরাফ। হালকা হলুদ ফুলহাতা শার্ট ও ঢোলা স্ল্যাকসে পরিবেশের সঙ্গে বেমানান, প্রায় বিদঘুটে লাগছে তাকে, ব্যাপারটা আরও হাস্যকর হয়ে উঠেছে ফিতে বাঁধা ব্রাউন জুতো পরায়। তার মন খুব খারাপ, কাজেই ব্যাপারটা লক্ষ করলেও চুপ করে আছে সোহানা।

একই ধরনের কাপড় পরেছে রানা ও সোহানা, ধূসর কমব্যাট ড্রেস। দেখে মনে হবে, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে ওরা। প্লেনে উঠে তাড়াতাড়ি সোহানার পাশের সিটটা দখল করে নিল আশরাফ। ওদের ঠিক পিছনে কাঠের বাক্সটার ওপর বসল রানা। হাত বাড়িয়ে সীটের পাশের একটা হাতল ঘোরাল ও, আশরাফের সীটটা পিছন দিকে হেলে পড়ল খানিকটা। 'হেলান দিয়ে বস, আরাম পাবে,' বলল রানা।

খোলা দরজা দিয়ে প্লেনে চড়ল এক লোক, একহাতে ফ্লাইং হেলমেট। দাগবহুল নীল জিনস আর রঙ ওঠা শার্ট পরে আছে। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা চুলের নিচে মুখটা প্রাণচঞ্চল এক তরুণের, কিন্তু চোখ দুটো ঠাণ্ডা ও শান্ত। সাত ঘাটের

পানি খাওয়া লোক, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। বলল, 'আরে, ওয়াটসন তুমি!'

'হাই, রানা!' নরম আমেরিকান কণ্ঠস্বর, ঠাণ্ডা ও শান্ত, পাঁশুটে চোখের মতই ভাব বোঝা যায় না। 'হাই, ম্যা'ম। লং টাইম।'

'হ্যাঁ, অনেক দিন,' বলল রানা। 'কেমন চলছে তোমার?'

'রেগুলার হয়ে গেছি, রানা।' হেলমেট পরে দরজাটা বন্ধ করল বিল ওয়াটসন। 'তোমরা সবাই রেডি তো?'

'হ্যাঁ। এজেন্ট বলছিল, তোমার জানা ভাল একটা জায়গা আছে, মাস থেকে মাইল আটেক দূরে, ওখানে আমাদেরকে তুমি নিরাপদে নামিয়ে দিতে পারবে।'

'শিওর। লম্বায় খানিকটা ছোট, তবে ম্যানেজ করে নেব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ওয়াটসন যখন আশ্বাস দিচ্ছে তখন আর চিন্তার কিছু নেই। স্যার ক্যানিং যখন বললেন তার পাইলট ইউরোপ ও আমেরিকার ছ'জন সেরা পাইলটের একজন, ও ধরে নিয়েছিল ভদ্রলোক বাড়িয়ে বলছেন। ওয়াটসনকে দেখে ভুলটা ভেঙে গেছে ওর। বিল ওয়াটসন উড়তে জানে। শুধু যে পেশা তা নয়, ওড়াটা তার নেশা। যে-কোন প্লেন নিয়ে উড়তে পারে সে। দুর্যোগের সময় বেশিরভাগ পাইলট যখন মাটি ছাড়তে চায় না, দেখা যাবে প্লেন নিয়ে দিব্যি ওঠানামা করছে বিল ওয়াটসন। মজার ব্যাপার হলো, নিয়ম ধরে প্লেন চালানো শেখেনি সে। প্লেন যেন তার অস্তিত্বের একটা অংশ, ধাতব কলকব্জার সমষ্টিমাত্র নয়। সেজন্যেই তাকে দেখে মনে হয় প্লেনের সঙ্গে ওড়ে সে, প্লেনটাকে চালায় না। মানুষ তার ডানার সাহায্যে উড়তে পারলে যে-সব কায়দা-কসরৎ করে মনের শখ মেটাত, ডানা না থাকা সত্ত্বেও প্লেনটাকে নিয়ে তারচেয়েও মজার ও বিপজ্জনক কায়দা-কসরৎ দেখাতে পারে বিল ওয়াটসন, অবলীলায়।

এয়ার সার্কাস-এর হয়ে প্লেন চালিয়েছে ওয়াটসন। বিভিন্ন সময়ে আমেরিকান ও রাশিয়ার জেট ফাইটার চালিয়েছে দূর প্রাচ্যে। এয়ারলাইন্স-এর পাইলট হিসেবে বড় আকারের জেটও চালিয়েছে। চোরাই মাল অর্থাৎ আর্মস, সোনা ও হিরোইন নিয়ে আকাশ পাড়ি দিয়েছে। আইন সম্মত হোক বা না হোক, সেটা বিল ওয়াটসনের দেখার বিষয় নয়, সে ভাড়া খাটে। টাকা দিলেই ভাড়া খাটে, পক্ষ বিপক্ষ বলে কিছু নেই তার কাছে। কারও প্রতি বিশ্বস্ত নয় সে, শুধু একজন বাদে, যে তাকে টাকা দেয়।

রানা ও সোহানা তাকে তিনবার ব্যবহার করেছে অতীতে। একবার তাইওয়ান, একবার হাইফা, শেষ বার এথেন্স থেকে পালাবার দরকার হওয়ায়। ওদের পরিচয় সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, তবে হয়ত আন্দাজ করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক চোরাচালানী দলের সদস্য হবে। প্রচুর টাকা নিলেও, বেঈমানীর কোন চেষ্টা না করে ওদেরকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে সে। তবে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়ার সময় এক পর্যায়ে বলেছিল, নিজেদের গরজেই ওদের উচিত তাকে বেশি টাকা দেয়া, কারণ তাহলে ওদের প্রতিপক্ষরা ওকে আরও বেশি টাকা অফার করে কিনে নিতে পারবে না। ফ্রিল্যান্স ও ভবঘুরে টাইপের লোক সে, একটানা

বেশিদিন কোথাও থাকে না।

'ফেরার পথে ফুয়েল নেবে কোত্থেকে, ওয়াটসন?' জানতে চাইল রানা।

'লোকজনদের আমি পরে নিয়ে গেছি ওখানে,' বলল ওয়াটসন, ওদেরকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে ককপিটের দিকে এগোল সে। 'তার আগে তিন হপ্তা ধরে প্রতিদিন গ্যাস আর পানি পৌঁছে দিয়েছি। মাসে আমাদের সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে মউজুদ আছে।'

সোহানা জানতে চাইল, 'ওয়াটসন···মাসে বেমানান কিছু লক্ষ করেছ তুমি? এমন কোন লোককে দেখেছ, যাদেরকে ওখানে তুমি নিয়ে যাওনি? বা অন্য কোন প্লেন? প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে চিন্তিত বলে মনে হয়েছে তোমার? তাঁর আচরণে···।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়াটসন, প্রথমে রানার দিকে, তারপর সোহানার দিকে তাকাল। চোখে হাসি নেই, কৌতূহল নেই, মুখেও কোন ভাব ফুটল না। নিচের ঠোঁটটা হঠাৎ কামড়াল সে। 'আমি, ম্যা'ম?' সমীহের সঙ্গে বলল, মাথা নাড়ল। 'এ-সব লক্ষ করার মানসিকতা কোন কালে ছিল আমার? আমি শুধু উড়ে যাই আর ফিরে আসি। কে কি করছে চেয়েও দেখি না, মাথাও ঘামাই না।'

ককপিটে ঢুকে পাইলটের সিটে বসল ওয়াটসন, রানার দিকে ফিরে সোহানা বলল, 'লোকটার কিছুই বদলায়নি।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

খক খক করে উঠে স্টার্ট নিল এঞ্জিন। সেফটি-বেল্ট বাঁধল আশরাফ, বলল, 'তোমাদের পুরানো বন্ধু, তাই না? তারমানে দলে আরেকটু ভারী হলাম আমরা।'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'ওয়াটসন শুধু ওড়াউড়ির ব্যাপারে আগ্রহী, কারও দলে থাকতে রাজি নয়। তবে স্যার ক্যানিং তাকে চাকরি দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে বেতন পায়, কাজেই তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে। ফ্লাইং অর্ডারস, দ্যাট ইজ। তার বাইরে আর কিছু জানতে চায় না সে।'

অনেক পিছনে ও উত্তরে রয়েছে অ্যাটলাস পর্বতমালা। ওদের সেসনা অসংখ্য বালিয়াড়ি পেরিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে যত দূর দৃষ্টি চলে, দুই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বাদামি রঙের কার্পেটের মত শুধু বালি আর বালি, মাঝে মাঝে দ্বীপের মত মাথাচাড়া দিয়ে আছে কালো বা খয়েরি পাথরের স্তূপ।

প্লেনের ভেতর খুব যে গরম লাগছে তা নয়, তবে বাম পাশে সূর্যটা এত বেশি উজ্জ্বল ও প্রখর যে ওদিকে তাকানো যায় না। বাধ্য হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হচ্ছে আশরাফকে। মরুভূমির বিশালত্ব উপলব্ধি করে নিজেকে তার অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে মনে হলো। তিন ঘণ্টা হলো একটানা উড়ছে ওরা, মাত্র একবার প্রাণের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে সে—দশটা উট, একটা বালির ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে, আরোহী সহ ওগুলোকে কালো বিন্দুর মত দেখাল। দু'বার শিংঅলা গজলা হরিণ দেখেছে রানা ও সোহানা, চোখ কুঁচকে বহু চেষ্টা করার পরও আশরাফের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি ওগুলো।

'এলাকা ভেদে,' বলল সোহানা। 'তাকানোর ভঙ্গি বদলাতে হবে তোমাকে। জঙ্গল, মরুভূমি, শহর, প্রতিটির জন্যে আলাদা দৃষ্টি আছে। সামান্য একটা প্র্যাকটিস করলে তুমিও দেখতে পাবে।'

সূর্য নিচের দিকে নেমে এসেছে, এই সময় প্লেনের কন্ট্রোল অটোমেটিক-এ দিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল বিল ওয়াটসন। সেসনার এঞ্জিন তেমন শব্দ করে না, তবু তার গলা নরম বলে একটু চড়াতে হল। 'আধঘণ্টার মধ্যে তোমাদেরকে নামিয়ে দেব, রানা।' সম্বোধনের মধ্যে ব্যঙ্গ বা কৌতুক নেই থাকলে নির্লিপ্ত একটা সুর আছে।

'জায়গাটা কি রকম, ওয়াটসন, একটা ধারণা দাও,' বলল রানা।

'সমতল বালি আর নুড়ি পাথর। পাশেই নিচু, আঁকাবাঁকা একটা রিজ। পানি নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াটসন। 'কতদূর পর্যন্ত পানি নেই তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবে। তবে এজেন্টের কথামত তোমাদের জন্যে অতিরিক্ত একটা ড্রাম তুলেছি প্লেনে। ঠিক আছে?'

'লোকবসতি?'

'পাগল।'

'ক্যারাভান রুট? আশপাশে?'

'থাকতে পারে, তবে আশপাশে নয়, অনেক পুবে ও উত্তরে। কথা দিচ্ছি, কারও সাথে তোমাদের দেখা হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

কন্ট্রোলে ফিরে গেল ওয়াটসন, পিছন থেকে আশরাফকে বলল রানা, 'খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। রিজটা ছায়া দেবে। একটা গুহাও পেয়ে যেতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। তার ভূমিকা আগেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাস থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকবে ওদের ঘাঁটি, ঘাঁটির দায়িত্ব থাকবে তার ওপর। দিন দশেকের পানি ও খাবার আছে ওদের সঙ্গে। প্রথম রাতেই রানা ও সোহানা পায়ে হেঁটে মাসে যাবে। তার মানে আজ রাতেই, প্রায় একটা ঝাঁকি খেয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করল আশরাফ। পরবর্তী প্ল্যান এখনও ঠিক করা হয়নি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হবে, আগে ওরা মাসের পরিস্থিতি দেখে ফিরে আসুক।

রানা বলল, 'আর্মস বেশির ভাগই তোমার কাছে রেখে যাব আমরা, আশরাফ। ওখানকার পরিস্থিতি বুঝে যখন যা দরকার নিয়ে যাব পরে।'

'তুমি তো কার-ফিফটিন চালাতে জানো, কটেজে থাকতে শিখিয়েছিলাম,' বলল সোহানা। 'বলা যায় না, একটা একজন গানম্যান দরকার হতে পারে আমাদের। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাকো।'

আশরাফের চোখের সামনে জেনির নিষ্পাপ সরল মুখটা ভেসে উঠল। চোয়াল শক্ত করল সে। 'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল, 'আমি রাজি।'

সূর্য এখন দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে, সরাসরি ওদের সামনে। প্লেন ঘুরিয়ে নিল ওয়াটসন, পুব দিকে মুখ করে ল্যান্ড করবে সে। নিচে নামছে প্লেন, এরইমধ্যে গাঢ়

ছায়া মুড়ে ফেলেছে নিচের মরুভূমিকে।

কোথায় ল্যান্ড করবে, ওদেরকে দেখাল ওয়াটসন। জায়গাটাকে ঘিরে একবার চক্কর দিল প্লেন। তারপর আবার নামতে শুরু করল। ল্যান্ড করার সময় কোন ঝাঁকি লাগল না, কাঁকরে চাকা পড়ায় শুধু একটা কাঁপন অনুভব করল ওরা, বিল ওয়াটসনের সেসনা যেন একটা হালকা প্রজাপতির মত বালি ছুঁলো।

অনেক কষ্টে একটা ঢোক গিলল আশরাফ। এখনও তীরবেগে ছুটছে ওদের প্লেন, সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে রিজটা। সরাসরি পাথরের একটা পাঁচিলের দিকে ছুটছে ওরা।

তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সোহানা। 'ভয় পেয়ো না। ওর নাম বিল ওয়াটসন।'

ঢালু পাথর-প্রাচীরের গায়ে চওড়া একটা ফাটল দেখা গেল, তার ঠিক বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল সেসনা। বন্ধ হলো এঞ্জিন, থামল কাঁপুনি। অলস ভঙ্গিতে নিজের সিট থেকে উঠে দাঁড়াল বিল ওয়াটসন।

'দশ মিনিট, ওয়াটসন,' বলল রানা। 'আশরাফ, ড্রামের রশিগুলো খোল। সোহানা, এসো, আশপাশটা আগে একবার দেখে নিই।'

দরজা খুলল সোহানা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে, পিছনে রানা। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে, হঠাৎ করে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। পাথর ও বালি গরম হয়ে আছে এখনও, আঁচ লাগল হাতে ও মুখে। 'দিনে গরম, রাতে শীত,' বলল সোহানা। 'আশরাফের সহ্য হলে হয়।'

'জেনির জন্যে এমন উতলা হয়ে আছে, এ-সব বোধহয় লক্ষ্যই করবে না,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে পাথুরে প্রাচীরের গায়ে চওড়া ফাটলটার দিকে। 'মাল-পত্র নামানোর পর ভেতরটা একবার দেখতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে ঘাঁটি হিসেবে কাজে লাগানো যাবে।'

আলোর টানেলটা প্রচণ্ড এক ঘুসির মত লাগল রানাকে। কোনও ধরনের স্পটলাইট, ফাটলের ঢালু দিকটা থেকে ওদের সামনে বালির ওপর তাক করা হয়েছে। আলোর একটা চোখ ধাঁধানো বৃত্ত, বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি উডহাউস। শার্ট আর ট্রাউজার পরে রয়েছে সে। একা। দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে মুখ করে, বিশ কি বাইশ কদম দূরে। তার মুখে কি যেন একটা বাঁধা রয়েছে, হাতদুটো পিছনে।

গুলি হলো এক পশলা। সাবমেশিনগানের আওয়াজ। জেনির কয়েক ফুট বাম দিকে বালি ও নুড়ি পাথর লাফিয়ে উঠল।

তারপর নিস্তব্ধতা নামল। কয়েক সেকেন্ড পর জেনির পিছনের অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা মার্জিত কণ্ঠস্বর। বিশুদ্ধ ইংরেজি, নিখুঁত উচ্চারণ, হাস্যরসে সমৃদ্ধ। 'ভাই ও বোনদের দলে স্বাগত জানাই তোমাদের। বিপদটা কার ও কি রকম, সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাজেই এ-ব্যাপারে কথা বলা বাহুল্য বলে মনে করি, রানা। শুধু এটুকু জানাই, প্রথমে তোমরা নয়, মারা পড়বে বেচারি অন্ধ মেয়েটা। তারপরই অবশ্য তোমাদের পালা। দু'জন একসাথে, ঠিক আছে?

চিরকাল একসাথে আছ।' হঠাৎ আঁতকে ওঠার ভান করল পাইথন। 'ওরে সর্বনাশ, তোমাদের সাথে দেখছি বীরপুরুষটাও আছে!'

মাথাটা একটু ঘোরাল রানা, দেখল প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আশরাফ। স্পটলাইটের আভায় পরিষ্কার দেখা গেল না তার চেহারা, তবে মনে হলো ভয়ে কুঁকড়ে আছে সে।

প্লেনের দরজা ধরে কাঁপুনিটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে আশরাফ। রানা ও সোহানা, দু'জনের হাতেই একটা করে কোল্ট ·৩২ দেখে সে ভাবল, ওগুলো সম্ভবত স্পটলাইট জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ওদের হাতে। দেখল, আঙুলের চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে সেফটি-ক্যাচ অন করল রানা, মুঠোটা আলগা করল যাতে শুধু ট্রিগার-গার্ডে আঙুল থাকায় রিভলভারটা ঝুলে পড়ে। তারপর শান্তভাবে ঝুঁকল রানা, বালির ওপর রাখল অস্ত্রটা, সিধে হলো ধীরে ধীরে। ওর দেখাদেখি সোহানাও তাই করল।

আর কিছু আশা করার নেই, কাঁপুনিটা আপনা থেকেই কমে এল, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ওদের পাশে দাঁড়াল আশরাফ।

'বেশ, বেশ। খুব খুশি হলাম,' অন্ধকার থেকে প্রশংসা করল পাইথন। 'তোমরা যদি বেচারি অন্ধ জেনির পেটের ওপর খেয়াল রাখ, আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ বাধবে না। বলেছি কি, প্রথমে আমরা ওর পেটে গুলি করব?'

সেসনার দরজায় উদয় হলো বিল ওয়াটসন, অলসভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল। ওয়াটসন প্রথম থেকেই সব জানত, উপলব্ধি করে প্রচণ্ড রাগ হলো আশরাফের।

মাথা না ঘুরিয়ে শান্তস্বরে জানতে চাইল রানা, 'কেন, ওয়াটসন?'

শার্টের ভেতর ওয়াটসনের চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকি খেতে দেখল আশরাফ। প্রায় প্রতিবাদের সুরে বলল পাইলট, 'যে আমাকে টাকা দেয়, আমি তার। যাকে দেখি সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, আমি তার পক্ষে। তোমরা জানো, রানা।'

অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল পাইথনের অতিকায় কাঠামো। তার হাত দুটো এত লম্বা, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো একজোড়া কুঠার বহন করছে সে, প্রায় হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। তার পিছনে, জেনির দু'পাশে, আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। অন্তত দু'জনকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। দু'জনের হাতেই সাবমেশিনগান।

দাঁড়িয়ে পড়ল পাইথন। নিঃশব্দে হাসছে। চোখে আগ্রহ, কয়েক সেকেন্ড সোহানাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর রানার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না। ধীরে ধীরে বিস্তৃত হলো মুখের হাসি। তারপর বলল, 'আশা করি এই ক'বছরে তোমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, রানা। থাপ্পড় খেয়ে পড়ে যেয়ো না, পড়লে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ো। আর যদি লড়ার কোন ইচ্ছে না থাকে, তা-ও বলতে পারো। তোমাকে তাহলে ওদের কারও হাতে তুলে দেব আমি। লড়তে নেমে ইঁদুর মারা আমার পোষাবে না। তোমার পাঁজরগুলোর খবর কি?'

সোহানা তাকিয়ে আছে রানার দিকে। শরীরের দু'পাশে হাত দুটো স্থির,

আলগাভাবে ভাঁজ করা আঙুলগুলো সিধে হলো, তারপর আবার ভাঁজ হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিল সোহানা। খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে ও। রানা সঙ্কেত দিল, এই মুহূর্তে কোন অ্যাকশন নয়। সাবমেশিনগানগুলো জেনির দিকে তাক করা রয়েছে। তাকেই প্রথম গুলি করা হবে। পরিস্থিতি কিভাবে নিজের অনুকূলে রাখতে হয় জানে পাইথন।

'অভিমান হলো নাকি, রানা? আমার কথার জবাব দেবে না?' অমায়িক হাসি ফুটল পাইথনের মুখে। 'আরে ভাই, রাগ কখনও পুষে রাখতে নেই। রাগের কোন মূল্যও নেই, যদি না তোমার বাহুতে বল থাকে। ঠিক আছে, তোমার সাথে পরে কথা বলব।'

এগিয়ে এল সে, তার প্রকাণ্ড ছায়া ওদের তিনজনকে প্রায় ঢেকে দিল। হেঁটে এসে আশরাফের সামনে দাঁড়াল পাইথন, প্রায় অস্তিত্বহীন দুই ভুরুর একটা কুঁকড়ে উঁচু হলো খানিকটা। 'দি সসপ্যান ম্যান,' বলল সে। 'ওহ্, ডিয়ার। আমি ধরেই নিয়েছিলাম তুমি পটল তুলেছ। তবে যে-সময়টুকু বেঁচে ছিলে বা আছ, সেটা ধার করা, তার মেয়াদ এই মাত্র শেষ হয়ে গেল।' প্রকাণ্ড একটা হাত স্যাঁৎ করে ওপরে উঠল, চেপে ধরল আশরাফের ঘাড়। আশরাফের মনে হলো শরীরের প্রতিটি নার্ভ অবশ হয়ে গেছে।

'বোকামি করছ,' রানার গলা অসম্ভব শান্ত।

'করছি বুঝি?' ঠোঁট টিপে হাসল পাইথন। 'সত্যি?' অনায়াসে আশরাফকে এক হাতে উঁচু করল সে, বালি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল পা দুটো।

'সত্যি।' রাগ নয়, রানার গলায় সামান্য ঘৃণা। 'জেনিকে দিয়ে তোমরা যা করাতে চাও, ওই বিষয়ে আশরাফ একজন এক্সপার্ট। দি টপ এক্সপার্ট।'

'বলে কি!' আশরাফের মাথাটা নিজের দিকে ঘোরাল পাইথন, যেন একটা পুতুলকে ধরে আছে সে।

তীব্র ব্যথা ঘাড় থেকে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, আশরাফ বুঝতে পারছে মৃত্যুর কাছ থেকে মাত্র কয়েক চুল দূরে রয়েছে সে। সবার সামনে তাকে অপমান করা হচ্ছে। তারপরও ঠোঁটে বোকার মত হাসি ফুটিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, সাথে করে আমি কোন রেফারেন্স নিয়ে আসিনি।'

তাকিয়ে থাকল পাইথন। পরমুহূর্তে তার প্রকাণ্ড বুক থেকে সগর্জনে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল অট্টহাসি। হাতটা আলগা করল সে, ভারি বস্তার মত বালির ওপর খসে পড়ল আশরাফ। 'মাইরি বলছি, ভারি মজা পেলাম,' বলল পাইথন, হাসির দমকে এখনও কাঁপছে সে। 'আমাদের কোন এক্সপার্ট দরকার আছে কিনা ঠিক জানি না, তবে আরও কিছুটা সময় তোমাকে ধার দেয়া যেতে পারে।'

সোহানার দিকে এগোল পাইথন। 'রানাকেও আমি খানিকটা সময় বরাদ্দ করেছি। কিন্তু তোমাকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাতে পারবে তুমি, সোহানা?'

'না।' সোহানার মধ্যে আড়ষ্ট কোন ভাব নেই, তবে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ

করছে পাইথনকে। 'তবু একটা কথা আছে। পরিস্থিতি এখন তোমার অনুকূলে, কিন্তু আমাদের কাউকে তুমি খুন করছ দেখলে অবশ্যই বদলে যাবে সেটা।' চট করে জেনি আর তার পাশে দাঁড়ানো সশস্ত্র লোক দু'জনের দিকে একবার তাকাল ও, তারপর আবার কুৎসিত মুখটার ওপর ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি আমাকে খুন করবে, সেটি হবার নয়, পাইথন। বলছি না যে কাজটা তুমি পারবে না। তবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, তোমার একটা চোখ আমি খুলে আনব।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'আর কিছু না পারি।'

'ব্যাপারটা জমে উঠছে! প্রতি মুহূর্তে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাচ্ছি আমি।' পাইথনের গলায় অকৃত্রিম উল্লাস। 'বোঝা যাচ্ছে ক'টা দিন দারুণ মজা পাব আমরা।'

টলমল করতে করতে সিধে হয়ে দাঁড়াল আশরাফ। তার শরীর কাঁপছে। কাঁপুনিটা বন্ধ করতে চাইছে, সেই সঙ্গে চিন্তার এলোমেলো জগৎ থেকে একটা উদ্ভট ধারণা খুঁজে নিতে চেষ্টা করছে।

চিন্তাটা তার মাথায় এসেছিল পাইথন যখন তাকে খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঘাড়ের পিছনটা ডলল সে, তাকাল সোহানার দিকে, তারপর কাতর কণ্ঠে বলল, 'রোদ লেগে চামড়ার ক্ষতি হতে পারে, তাই ক্রীম মেখেছিলাম। ওর হাতের ঘষা লেগে সবটুকু উঠে গেছে।'

চোখে অবিশ্বাস, আশরাফের দিকে তাকিয়ে থাকল পাইথন। তারপর আবার তার বুক থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল সগর্জন হাসি। অস্বাভাবিক লম্বা হাত দিয়ে উরুর ওপর চাপড় মারল সে, ঠাস করে পটকা ফাটার আওয়াজ হলো। 'আরে, এ তো দেখছি আমার সামনে কৌতুকের ভাণ্ডার খুলে গেছে! হাসির এত খোরাক নির্ঘাৎ আমার আয়ু পঞ্চাশ বছর বাড়িয়ে দেবে!' অন্ধকার ফাটলের দিকে ফিরল সে, হাত তুলে সঙ্কেত দিল। জেনির দু'পাশ থেকে সশস্ত্র লোক দু'জন আরও কাছে সরে এল, একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে। ওদের পিছন থেকে এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ ভেসে এল, পরমুহূর্তে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা ল্যাণ্ড-রোভার।

বিল ওয়াটসনের দিকে তাকাল পাইথন, এখনও প্লেনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'অন্ধ মেয়েটা আর দু'জন গার্ডকে নিয়ে যাও তুমি, ওয়াটসন। আমাদের নতুন মেহমানরা আমার সাথে ল্যান্ড-রোভারে যাবে।'

সাবধানে সিগারেটটা নেভাল ওয়াটসন, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'শিওর।'

ঠাণ্ডায় হি হি করছে আশরাফ। তার উদোম পিঠে বরফের মত ছ্যাঁকা দিচ্ছে পাথরের দেয়াল। সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে তার, পরে আছে শুধু আন্ডারওয়্যার। একই অবস্থা রানারও, আর সোহানা শুধু প্যান্টিজ ও ব্রেসিয়ার পরে আছে। ওর পাশেই, খালি মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, সবার হাত মাথার ওপর।

পাথুরে চেম্বারটায় আলোর কোন অভাব নেই, দুটো ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলছে। লম্বা একটা টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে রয়েছে ওদের কাপড়চোপড়। টেবিলের এক

প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন লোক। ওদেরকে চেনে আশরাফ, পেনিফিদার ও ক্রনেল। লম্বা ও ঢোলা শর্টস পরে থাকায় ভাঁড়ের মত লাগছে ক্রনেলকে, তবে তার নীল চোখ ও নিষ্ঠুর হাসির মধ্যে কৌতুকের ছিটেফোঁটাও নেই। পেনিফিদারের পরনে ট্রপিক্যাল স্যুট। রানার শার্টটা ব্যস্ত হাতে সার্চ করছে সে। বিজয়ীর হাসি বা উল্লাস, কিছুই নেই চেহারায়। মুখের ভাব নির্লিপ্ত, শুধু চোখ দুটোয় ঠাণ্ডা এবং অশুভ কি একটা চকচক করছে।

স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে রানার কমব্যাট বুটের সোল ফাঁক করল ক্রনেল। রাবারের ভেতর একজোড়া ফাটল দেখা গেল। একটা থেকে বেরুল ছুরির একটা ফলা। অপরটা থেকে চ্যাপ্টা হাতল।

ক্রনেলের মুখে সবজান্তার হাসি। স্ক্রু এঁটে হাতলের সঙ্গে ফলাটা জোড়া লাগাল সে, তারপর এক পাশের স্তূপের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাপড় ও জুতো থেকে পাওয়া জিনিসগুলোই শুধু রাখা হয়েছে ওখানে। এবার সাবধানে জুতোর গোড়ালিটা পরীক্ষা করতে শুরু করল।

ফোল্ডিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে পাইথন, অলসভঙ্গিতে চুরুট ফুঁকছে। নির্লিপ্ত, প্রায় অন্যমনস্কভাবে ওদের কাজকর্ম দেখছে সে। ডান হাতটা হাঁটুর ওপর, মুঠো করে ধরে আছে ভারি একটা অটোমেটিক মাউজার পিস্তল। বিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন সহ কুৎসিত একটা অস্ত্র।

চেম্বারে আরও একজন লোক রয়েছে। কড়া ভাঁজের, গাঢ় রঙের স্ল্যাকস পরে আছে সে, এক ধরনের জিম ভেস্ট-এর ওপর গায়ে কার্ডিগান চড়িয়েছে। শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, হাত দুটো পিছনে। খানিক পরপর পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু করছে শরীরটাকে, তারপর আবার ধীরে ধীরে গোড়ালি ঠেকাচ্ছে মেঝেতে। পালা করে সবার ওপর নজর রাখছে সে।

ল্যান্ড-রোভারে ওদের ওপর কড়া পাহারা ছিল গার্ডদের। এখানে আসতে বিশ মিনিট সময় লাগে। চওড়া পাহাড় চূড়া ধরে সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়েছে ড্রাইভারকে, শতবর্ষের বালি-ঝড় পথটাকে অসম্ভব সরু করে রেখেছে। পাথুরে শহর মাসে পৌঁছুবার ওটাই একমাত্র রাস্তা। অন্ধকারে উপত্যকার কিছুই দেখতে পায়নি ওরা। ল্যান্ড-রোভার থেকে নামার পর তাড়াহুড়ো করে একটা প্যাসেজে ঢোকানো হয় ওদেরকে। পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে টানেলটা। তারপর এই চেম্বারে এনে বসানো হয়েছে।

নিজের মনের অবস্থা অদ্ভুতই লাগছে আশরাফের। চিরকেলে ভীতু সে, এই মুহূর্তেও ভয় পাচ্ছে, তবে ভয়টাকে একটা সীমার মধ্যে দমিয়ে রাখতে পারছে। সে জানে, গুরুতর এই বিপদের মধ্যে আপাতত অসহায় হলেও, রানা ও সোহানা নিজেদের অসহায়বোধকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না। জানে, দু'জনেই ওরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, কে কি বলছে শুনছে, লক্ষ করছে কার কি অভ্যাস, বিশ্লেষণ করছে বাস্তব পরিস্থিতি, চিন্তা করছে সম্ভাবনা নিয়ে। এ-সব কাজে এত ব্যস্ত ওরা, হতাশা বোধ করার সময় নেই। ওরা কি করছে বোঝার পর আশরাফ নিজেও তাই করার

চেষ্টা করছে এখন।

আলো যখন আছে, নিশ্চয়ই আলোর একটা উৎসও আছে। সম্ভবত জেনারেটর আছে কোথাও। কোথায় আছে জানতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে। তার অনুমান যদি ভুল না হয়, গার্ডগুলো আলজেরিয়ান, শহুরে লোক। তারা কেউ ইংরেজি জানে না, ভাঙা-ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে পারে। ওদের ভাষা আসলে আরবী। আরবী বোঝে না সে, তবে রানা ও সোহানা বোঝে। এটা একটা তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক। গার্ডদের ঘুষ দিতে চাইলে ওদের ভাষা বুঝতে হবে। পাইথনের দিকে মনোযোগ দিল আশরাফ, তার মনে হলো এই একটি ক্ষেত্রে ভাল কিছু অর্জন করার সুযোগ আছে তার, যা রানা বা সোহানার নেই। পাইথনের সঙ্গে ঠিক কি ধরনের আচরণ করা দরকার, বুঝে নিয়েছে সে। শুরুতে অভিনয়টা বোধহয় মন্দ হয়নি, সম্ভবত তার ওই অভিনয়ের কারণেই এখনও বেঁচে আছে সে।

পাইথনকে আনন্দ দিয়েছে সে। তাকে হাসিয়েছে। ওর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তার। আশপাশে একটা হাসির ভাণ্ডার থাকলে খুশি হবে পাইথন। যে লোক হাসাতে পারে তাকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধে দেয়াটা স্বাভাবিক। অন্তত আশা করতে দোষ কি।

অভিনয়টা চালিয়ে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে আশরাফ। তবে জানে যে অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে কাজটা। বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে কৌতুক করার চেষ্টা করলে মারাত্মক বোকামি হবে সেটা। কারণ পাইথনের চেহারায় একটা পরিবর্তন এসেছে। পেনিফিদার আর ক্রনেল সাবধানে কাজ করছে, উদ্ধার করা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে পাইথন, ভাঁজবিহীন প্রকাণ্ড মুখ থমথম করছে তার।

স্তূপটার দিকে তাকাল আশরাফ। কয়েকটা জিনিস চিনতে পারল না, তবে বেশিরভাগই চেনে। দুটো কোল্ট, একটা ছোট এমএবি অটোমেটিক। লেদার হারনেসে ভরা রানার একজোড়া থ্রোইং-নাইফ। ওর জুতো থেকে পাওয়া গেছে আরও একটা ছুরি। সোহানার স্ল্যাকস-এর থাই পকেট থেকে পাওয়া গেছে একটা আট ইঞ্চি মেটাল টিউব, টেনে লম্বা করে ওটাকে ধনুকে রূপান্তর করা যায়। সরু ইস্পাতের রড পাওয়া গেছে আরেক পকেটে, স্ক্রু এঁটে জোড়া লাগালে ওগুলো হয়ে উঠবে তীর। সোহানার কাছ থেকে আরও পাওয়া গেছে এক ফাইল অ্যানেসথেটিক নোজ-প্লাগ, একটা স্লিং, ছ'টা গোল আকৃতির সীসার বল। রানার কাছ থেকে আরও পাওয়া গেছে একটা ঝর্ণা কলম, ভেতরে কালির বদলে অ্যাসিড। প্রতিটি জিনিসের নাম একটা নোট-বুকে লিখে নিচ্ছে ক্রনেল। লেখার দরকার কি? ভাবল আশরাফ। ব্যাপারটা মনে গেঁথে রাখল সে, সব কিছুর নোট রাখা ক্রনেলের একটা অভ্যাস।

আঙুল দিয়ে টিপে সোহানার শার্টের কাফ পরীক্ষা করল পেনিফিদার, তারপর একটা ছুরি তুলে নিয়ে সেলাই কাটল, খুলে ফেলল হাতার কাফ। ভেতর থেকে চৌকো ও অত্যন্ত পাতলা এক টুকরো সীসা বের করল সে, কাফের ভেতর লাইনিং-এর মত ছিল।

ক্রনেল জানতে চাইল, 'ওটা আবার কি?'

হাতের চাপ দিয়ে সীসার পাতটাকে গোল পাকিয়ে ফেলল পেনিফিদার, তালুতে ফেলে ওজন নিল। 'আস্তিনটা ছিঁড়ে ফেল, এই সীসার বল একটা অস্ত্র হয়ে গেল।' চোখে নগ্ন ঘৃণা, সোহানার দিকে তাকাল সে।

স্তূপটার দিকে তাকাল ক্রনেল। 'এর আগে ওরা আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে, কারণটা পরিষ্কার—সাথে এক গাদা ইকুইপমেন্টও রাখে ওরা,' বলে আশরাফের শার্টটা ছুঁড়ে দিল সে। 'তবে, এবার পরিস্থিতি অন্যরকম।' স্তূপটার দিকে আবার তাকাল সে। 'আর বোধহয় কিছু নেই। না, আছে। আর মাত্র একটা।' টেবিল ঘুরে সোহানার সামনে এসে দাঁড়াল সে, ওর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ঘোরো, সুন্দরী!'

প্রতিবাদ না করে ঘুরল সোহানা। হাত তুলে তার ঘাড়ে হাত দিল ক্রনেল, ইলাস্টিক ব্যান্ড দুটো খুলে নিল চুল থেকে। এক রাশ কালো চুল আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল। আবার হাত তুলে চুলের ভেতর আঙুল ঢোকাল ক্রনেল, খুলির গায়ে কিলবিল করছে। তারপর পিছু হটল এক পা, দেখা গেল তার হাতে একটা তিন ইঞ্চি লম্বা সুঁই রয়েছে। হাসল ক্রনেল। 'সুযোগ পেলেই কারও চোখে ঢুকিয়ে দিত। আর হার্টে ঢোকালে তো কথাই নেই।' আগের জায়গায় ফিরে গেল সে।

ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল পাইথন। 'ওরা কি এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র?'

মাথা ঝাঁকাল পেনিফিদার। 'হ্যাঁ।'

'এবার কোন ভুল হয়নি তো?' পাইথনের মুখে নরম, সবিনয় হাসি।

এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে পেনিফিদারের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'এ-ধরনের ঠাট্টা আর কারও সাথে কোরো, পাইথন। একবার তো বলেছি, ওদের কাছে আর কিছু নেই।'

শব্দহীন হাসির দমকে ঝাঁকি খেল পাইথনের শরীর। 'তুমি আহত বোধ করছ,' সকৌতুকে বলল সে। 'সত্যি আমি দুঃখিত।' হাসতে হাসতে চেয়ার ছাড়ল। 'আবার তুমি ঘুরে দাঁড়াতে পার, সোহানা।' তার নির্দেশ মত ঘুরল সোহানা। ওর দিকে নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল পাইথন। সোহানার চোখে পলক নেই, সে-ও শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাতের পিস্তলটা নাড়ল পাইথন। 'এবার তুমি,' বলল সে, ঘোষণার সুরে, 'কাপড় পরতে পারো। কারণ একটু পরই তোমাদের যত্ন নেব আমরা।'

তিন

পাথরের এই চৌকো ঘরটা ছোট, বারো ফুটের বেশি হবে না। ক্ষতবিক্ষত মেঝেটা খালি। একটাই সরু প্রবেশপথ, কাঠের ফ্রেম সহ ভারী একটা দরজা লাগান হয়েছে সম্প্রতি। রাবার দিয়ে মোড়া হয়েছে ফ্রেমের কিনারাগুলো, যাতে কোন বাতাস ঢুকতে না পারে। কবাটে কী-হোল বা হাতল নেই। মোটা একজোড়া লোহার বার

দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করা হয় দরজাটা।

বার দুটো সকেটে ঢুকল, আওয়াজটা শুনতে পেল আশরাফ। সে ভাবল, তিনজন মানুষ আমরা, অক্সিজেন শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, নিরেট কবাটে ঠেকে আছে একটা কান। দেয়ালের একটা কোণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোহানা, ওর দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রায় গম্বুজ আকৃতির সিলিঙের দিকে উঠে গেল। ওর চেহারায় কোন ভাব নেই। আশরাফ ওকে এত ভালভাবে চেনে যে ওর এই চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে, সোহানা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সিলিঙের দিকে তাকাল সে-ও। ছোট একটা ভেন্টিলেটর দেখল, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে চার ইঞ্চি। স্রেফ একটা অমসৃণ গর্ত, দেখে মনে হয় প্রথম যখন উপত্যকার পাঁজর কেটে মাস শহরটা গড়ে তোলা হয় তখনকার তৈরি।

কবাট থেকে কান সরিয়ে দরজার গায়ে হাত দিয়ে চাপ দিল রানা, কতটা শক্ত পরীক্ষা করছে। 'আশরাফ, আমাদের মধ্যে শুধু তুমি খানিকটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছ,' নিচু গলায় বলল ও। 'পাইথনের সাথে তোমার খেলাটা ঠিক আছে। চালিয়ে যেতে হবে।'

'চেষ্টা করব,' বিড়বিড় করল আশরাফ, সরে এল রানার কাছে। 'তবে কতক্ষণ চালান সম্ভব বলা যাচ্ছে না। লোকটা বোকা নয়। যদি বুঝতে পারে যে আমি ভান করছি···।'

'খুব বেশিক্ষণ তোমাকে ভান করতে হবে না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চাইলে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'পাইথনকে তোমার কেমন লাগল, রানা?' জানতে চাইল সোহানা।

সবাই ওরা নিচু গলায় কথা বলছে। 'আগের মতই। কিছুই হারায়নি সে।' গম্ভীর হলো রানা।

'আর পেনিফিদারকে?'

'তার বোধহয় আগের সেই ধার আর নেই।'

'ওদের মধ্যে বস্ কে?'

'বলা যাচ্ছে না।' দরজার কাছ থেকে সরে এল রানা, সোহানার পাশে দাঁড়িয়ে গর্তটার দিকে তাকাল। 'কেউ কারও অধীনে কাজ করছে বলে মনে হয় না।' হঠাৎ রাগে লালচে হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'দুঃখিত, আমিই তোমাদেরকে এই ফাঁদে টেনে এনেছি।'

'তুমি?' অবাক হয়ে তাকাল আশরাফ। 'তুমি কিভাবে টেনে আনলে?'

'এখনও বোঝনি? ওয়া···,' হিসহিস করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওদের মাথার ওপরের গর্তটা থেকে, চুপ করে গেল রানা। দশ সেকেন্ড পর শব্দটা থেমে গেল। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। ঘরটা মিহি বাষ্পে ভরে গেছে। কি এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল আশরাফ। দেখল, মৃদু একটা ঝাঁকি খেল সোহানা, মুখ স্পর্শ করার জন্যে হাত দুটো তুলল। পরমুহূর্তে সে নিজেও অনুভব করল, তার মুখ ও কপালে কাঁটার মত কি যেন বিঁধছে, হুল ফোটার মত। মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যে শুরু হলো তীব্র ব্যথা। মুখে হাত রেখে সোহানার দিকে তাকাল রানা, কর্কশস্বরে বলল, 'বুঝতেই পারছ কি!'

'কী?' আতঙ্কে চিৎকার করল আশরাফ, পরমুহূর্তে মুখে অসংখ্য সুঁচের তীব্র খোঁচা খেয়ে লাফাতে শুরু করল, হাঁপাচ্ছে। দ্রুত তার পাশে চলে এল সোহানা, ব্যথায় সরু হয়ে আছে চোখ দুটো।

'অ্যান্টি-রায়ট নার্ভ গ্যাস,' হিসহিস করে বলল রানা।

'ধৈর্য ধরতে হবে, আশরাফ,' গলার স্বর নরম রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল সোহানা। 'শক্ত করো নিজেকে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে যাচ্ছে···।' লক্ষ করল, আশরাফ ওর কথা শুনছে না। নত করা মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে গোঙাচ্ছে সে, কেউ যেন বিরতিহীন চাবুক মারছে তাকে।

সাধারণ নার্ভ গ্যাস স্থায়ী কোন ক্ষতি করে না, তবে এর যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন। কয়েক ফোঁটা গ্যাস স্প্রে করলে আধ ঘণ্টার বেশি কাজ করে। মুখের তেলতেলা ভাবের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে, ফুসফুসের অক্সিজেনও নষ্ট করে দেয়, ফলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে পেশী। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ব্যথাটা, প্রচণ্ড দাঁত ব্যথার চেয়েও কয়েক গুণ তীব্র হয়ে ওঠে।

দু'চোখ বেয়ে হড়হড় করে পানি গড়াচ্ছে, ব্যথায় কমে যাচ্ছে দৃষ্টিশক্তি, আশরাফকে টেনে মেঝেতে বসাল রানা। ওর পাশেই রয়েছে সোহানা, সাহায্য করছে ওকে। ব্যথা সহ্য করার জন্যে দু'জনেই দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। ওদের হাতের চাপে দেয়ালে হেলান দিল আশরাফ।

'তুমি···তুমি অজ্ঞান হতে পারবে, সোহানা?' হাঁপাচ্ছে রানা।

'হুঁউ।' দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল আওয়াজটা। তারপর জানতে চাইল সোহানা, 'কিন্তু আশরাফের কি হবে?'

'ওকে আমি অজ্ঞান করব। ক্যারটিড।' শরীরটা ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে রানার, গলার আওয়াজ কাঁপা কাঁপা। 'এস, দু'জনের মাঝখানে বসাই ওকে। খাড়া করে।'

গোঙাচ্ছিল আশরাফ, এখন ফোঁপাচ্ছে। চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়েছে তার, শুধু ব্যথা ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না। যেন অন্য কোন এক দুনিয়ায় তার আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে, অনুভব করল রানার একটা হাত তার গলায় চেপে বসেছে। রানা কি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলছে?···না···এখনও শ্বাস নিতে পারছে সে। তাহলে কি···কেন···?

বর্ণনার অতীত স্বস্তিবোধ করল আশরাফ, কারণ গাঢ় একটা অন্ধকারে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে সে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ব্যথাটাকে। জ্ঞান হারাল সে।

আশরাফের ঘাড় থেকে হাত নামাল রানা। লম্বা করল পা দুটো, একটার ওপর তুলে দিল অপরটা। হাত দুটো থাকল হাঁটুর ওপর, তালু ওপর দিকে। তাকিয়ে আছে ও, তবে কিছুই দেখছে না। মুখের চেহারায় প্রাণের কোন লক্ষণ থাকল না।

সোহানাও এই একই ভঙ্গিতে বসেছে, আশরাফের আরেক পাশে।

প্রথমে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ও নিয়মিত করতে হবে। কাজটা কঠিন, কারণ

জোর খাটানো চলবে না। এই মুহূর্তে ব্যথার সঙ্গে লড়ছে না রানা, ঢেউয়ের মত বয়ে যেতে দিল সেটাকে।

অটোসাজেশনে কাজ হলো। ষাট সেকেন্ড পর ব্যথাটাকে মনে হলো ওর অস্তিত্ব থেকে আলাদা একটা কিছু। আছে, অনুভব করা যায়, তবে ওর শরীরের কোন অংশ নয়। ধীরে ধীরে, জোর না খাটিয়ে, স্বেচ্ছায় ওটাকে আরও দূরে সরে যেতে দিল ও।

তারপর ব্যথাটা নগণ্য ও দূরের একটা জিনিস বলে মনে হলো। সেটাকে এভাবেই ধরে রাখল রানা, পুরোপুরি অদৃশ্য হতে দিল না। ওর মনের একাংশে অ্যালার্ম দেয়া আছে, পাঁচ মিনিট পর সেটা বাজলেই নড়ে উঠবে রানা, যদিও সচেতনভাবে নয়। পাঁচ মিনিট পর আশরাফের ঘুমন্ত ব্রেন-এ রক্ত সঞ্চালনের ফলে জ্ঞান ফিরে পাবে সে। আগেই সাজেশন দিয়ে রাখায় সম্মোহিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে না এসেও আশরাফের ঘাড়ে হাত রাখবে রানা, আবার চাপ দেবে ক্যারটিডে, রক্ত প্রবাহ বন্ধ করার জন্যে।

সোহানার শ্বাস-প্রশ্বাসও এবার রানার সঙ্গে তাল মেলাল, প্রতি এক মিনিটে চারবার নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা। ওদের চোখ খোলা, সামান্য ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই।

যেন দুটো নিষ্প্রাণ, স্নায়ুহীন ও শান্ত মূর্তি, অজ্ঞান আশরাফের দু'পাশে বসে আছে, চলে গেছে শান্তিময় অন্য এক জগতে।

কানের লতিতে কেউ চিমটি কাটছে। বিরক্ত হয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করল আশরাফ। ঘুম থেকে তার জাগতে ইচ্ছে করছে না। কি যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়তে চাইছে তার, কিন্তু ধরা দিতে দিতেও দিচ্ছে না। এরকম পাঁচ-সাতবার হলো। প্রতিবার মনে হল অন্ধকার রাজ্য থেকে ক্রমশ আলোর একটা জগতে উঠে আসছে সে, যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে ব্যথাটা। কিন্তু তারপর ব্যথা নয়, এই চাপটা অনুভব করল। একটা নখ তার কানের লতিতে ডেবে গেল। রাগ হলো তার, মাথাটা সজোরে ঝাঁকাল,তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুলল চোখ দুটো। মেঝেতে পিঠ দিয়ে শুয়ে রয়েছে সে। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা, পাশে সোহানা। ওদের চোখ দুজোড়া অস্বাভাবিক লাগল তার, যেন বিস্ফারিত হয়ে আছে।

হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল আশরাফের, ধড়মড় করে উঠে বসল সে, একটা হাত ঝট করে উঠে গেল মুখে। এখন কোন ব্যথা নেই ওখানে। নার্ভ গ্যাস, রানা বলেছিল। অ্যান্টি-রায়ট গ্যাস। কথাটা মনে পড়তে শিউরে উঠল সে। রানা তাকে অজ্ঞান করে রেখেছিল। সেজন্যেই কষ্ট পাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে সে। 'কতক্ষণ হয়েছে?' ভারি গলায় জানতে চাইল সে, রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আধ ঘণ্টার মত।'

'ওহ্ গড!' মাথার চুলে আঙুল চালাল আশরাফ। 'আমার মগজ অসাড় হয়ে

গিয়েছিল!'

'তা আমাদেরও গিয়েছিল,' বলল সোহানা, হাসল, তারপর একটা হাত ধরল আশরাফের। 'চিন্তা কোরো না। গ্যাসের প্রভাব যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম আমরা।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল আশরাফ, বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'এসপিওনাজ জগতে আজও যে ওরা সারভাইভ করছে, কারণটা শুধু ওদের ফিজিক্যাল স্কিল নয়। ওদের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে মনে। মনের সাহায্যে নিজেদেরকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ওরা, মনে হয় যেন জাদু জানে।'

আশরাফ বলল, 'এরই নাম পাইথনের যত্ন। সর্বনাশ, ওরা কি জেনিকেও এই···?' কথা শেষ না করে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে, বাধা দিল রানা।

'নোড়ো না আশরাফ,' চাপা গলায় বলল ও। 'যে-কোন মুহূর্তে আমাদেরকে দেখতে আসবে ওরা। যেমন দেখবে বলে আশা করে আছে, এসে যেন ঠিক তেমনই দেখে। সরে বস তোমরা। এমন ভাব কর যেন ভয়ে ও ক্লান্তিতে কুঁকড়ে আছো।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর আওয়াজ হলো দরজায়, লোহার বারগুলো সকেট থেকে বের করা হলো। একটা গড়ান দিয়ে ভাঁজ করা হাতের কনুইয়ে মুখ গুঁজল রানা। কাত হয়ে দেয়ালে হেলান দিল সোহানা, মাথাটাও দেয়ালে ঠেকে থাকল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, চোখ দুটো আধবোজা।

ঘরে ঢুকল ব্রুনেল। তার পিছনে ক্ষতবিক্ষত একটা মুখ দেখা গেল, হাতে সাবমেশিনগান। লোকটা আলজিরিয়ান, তার বেল্ট থেকে ঝুলছে অ্যারোসল-এর একটা সিলিন্ডার।

'খুবই কাজের দাওয়াই, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ব্রুনেল, হাতের তালু দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষছে। 'মেড ইন আমেরিকা, অর্থাৎ আমাদের দেশের জিনিস। তবে আমাদের কেমিস্ট লন্ডনে বসে আরও উন্নত করেছে। কেমন আছ গো তোমরা? যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি তো?'

কেউ সাড়া দিল না। বন্দীদের দিকে পালা করে তাকাল ব্রুনেল, নিঃশব্দে হাসল।

আবার শুরু করল সে, 'এই দাওয়াই প্রথমদিকে রোজ তিনবার করে দেয়া হয়েছে বাকি সবাইকে। এখন আর প্রায় ব্যবহারই করতে হয় না। যে-কোন লোককে "জী-হুজুর" বলাতে এই দাওয়াইয়ের কোন জুড়ি নেই।' শব্দ করে হেসে উঠল ব্রুনেল। 'তবে দাওয়াইটার স্বাদ এই একবারই পেলে তোমরা। তোমাদের পাইথন একটা উন্মাদ। বাকি সবার মত তোমাদেরকে জড় পদার্থে পরিণত করতে রাজি নয় সে।' বোধহয় পাইথনকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই তার ভরাট অট্টহাসি অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। পেনিফিদারকে কি বলেছে পাইথন, তা-ও অনুকরণ করে শোনাল সে, 'তাহলে ওদের কাছ থেকে আরও বেশি মজা আদায় করা যাবে, পেনিফিদার। ওরা নিস্তেজ হয়ে গেলে আমি কোন আনন্দই পাব না।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল রানা, চোখ দুটো ভারি হয়ে আছে। স্যাঁৎ করে এক পা পিছিয়ে গেল ব্রুনেল, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল আলজিরিয়ান গার্ডকে। এক পা সামনে বাড়ল গার্ড, সাবমেশিনগানটা রানার দিকে তাক করল।

'পাইথনের জায়গায় আমি হলে, প্রথম সুযোগেই গুলি করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতাম,' বলল ব্রুনেল। 'এখনও পারি, শুধু একটা ছুতো দরকার। রানা, এবার তুমি দাঁড়াও। সাবধান, আমাকে কোন সুযোগ দিয়ো না।'

প্রথমে রানা, ওর দেখাদেখি বাকি দু'জনও, ধীরে ধীরে দাঁড়াল।

'তোমাদেরকে এখন কমন রূমে নিয়ে যাওয়া হবে, বাকি সবার কাছে,' বলল ব্রুনেল। 'বাকি সবাই মানে লেবার হিসেবে যাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছে। পানি পাবে মাথা পিছু পনেরো পাইন্ট। একটা সৎ পরামর্শ দিই, পনেরো পাইন্টের প্রায় সবটুকুই খেয়ে ফেল, যদিও সেক্ষেত্রে বাকি সবার মত নোংরা থাকতে হবে তোমাদের। এই গরমে সারাটা দিন মাটি খুঁড়লে শরীরের রক্তও ঘাম হয়ে ঝরে যাবে।'

ম্লান দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও সোহানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় নির্দেশ দিল ব্রুনেল। দরজার ঠিক বাইরে আরও একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বন্দীরা ছোট একটা প্যাসেজ ধরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। রানার কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে আশরাফ দু'পাশের কাঁধ ঝুলিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে।

রাতের বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা। উপত্যকার পুবদিকের পাঁচিল ধরে একশো গজের মত এগোল ওরা, পাশ কাটিয়ে এল পাথর কেটে তৈরি করা বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো সুড়ঙ্গমুখ। পাথর ধসে পড়ায় সুড়ঙ্গের কয়েকটা মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

ওদের সামনে চৌকো একটা খিলান ও ভারি কাঠের দরজা। গ্যাস চেম্বারেও এরকম একটা নতুন দরজা দেখেছে ওরা, তবে এটা অনেক বড় ও ভারি। দরজার পাশে আরও দু'জন গার্ড বসে আছে, হাতে সাবমেশিনগান। ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে দাঁড়াল তারা। দরজার ফ্রেমের পাশেই পাথরে গাঁথা রয়েছে এক জোড়া ব্র্যাকেট, সেগুলোর ভেতর থেকে দুটো ইস্পাতের বার বের করল একজন গার্ড।

ব্রুনেল বলল, 'এক ঘণ্টা পর আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। ভাল কথা, এখানকার আইন-কানুন সম্পর্কে জেনির কাছ থেকে জেনে নিয়ো। বাকি সবাই তেমন কিছু বলতে পারবে না।'

এ যেন একটা আর্মি ব্যারাক রূম, ওদের পিছনে দরজা বন্ধ হতে ভাবল রানা। লম্বায় প্রায় আশি ফুট, চওড়ায় ত্রিশ ফুটের মত, দু'দিকে সারি সারি ফেলা হয়েছে ক্যাম্প বেড। প্রাচীন মিস্ত্রিদের খাড়া করা পাথরের চারটে পিলার এখনও টিকে আছে, ধরে রেখেছে বিশাল ছাদটাকে। সিলিং থেকে ঝুলছে তিনটে ইলেকট্রিক ল্যাম্প।

বয়স্ক এক লোক, মুখটা ডেবে আছে ভেতর দিকে, মাথা নিচু করে বসে রয়েছে একটা বেডে। চেহারায় অন্যমনস্ক ভাব, তাকিয়ে আছে নিজের হাত দুটোর দিকে। লন্ডন ছাড়ার আগে রানা ও সোহানা প্রফেসর ডেভিড হোয়াইটস্টোনের ছবি দেখেছে। ভদ্রলোকের বয়স ছাপান্ন কি সাতান্ন। কিন্তু এই লোকটাকে দেখে মনে হলো বয়স আশির ওপর ছাড়িয়ে গেছে। ভাল করে তাকাতে প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে তার চেহারার মিলটা লক্ষ করল রানা। দরজা খোলার সময় মুখ তুলে তাকাননি তিনি। ক্যাম্প বেডে শুয়ে রয়েছে আরও ছ'জন লোক, তারাও কেউ নড়াচড়া করেনি।

কাছাকাছি লোকটার দিকে তাকাল রানা। হয়তো তরুণই, তবে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। দাড়িতে ঢাকা পড়ে আছে নাক থেকে মুখের নিচের অংশ, এলোমেলো মাথার চুল কপালটাকেও প্রায় ঢেকে রেখেছে। ভয়ের ভাব ছাড়া চোখ দুটো শূন্য। খুক করে কেশে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। ওর দিকে তাকাল সে, কয়েক সেকেন্ড পর কাতর কণ্ঠে বলল, 'চিঠি একটা সত্যি লিখেছি, তবে ঈশ্বরের কিরে, তাতে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিনি।'

হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে বন্দীদের চিঠি লিখতে দেবে ওরা, দেখে যেন মনে হয় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। কিন্তু চিঠিতে যদি এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আভাসেও কিছু লেখা হয়, গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গিয়ে দাওয়াই দেয়া হবে।

'ঠিক আছে, শান্ত হও,' বলল রানা। 'আমরা তোমাদের লোক।'

অসুস্থবোধ করছে আশরাফ। ব্যথাটা মাত্র দু'মিনিট সহ্য করেছে সে। এই লোকটা, এরা সবাই, পুরো আধ ঘণ্টা ধরে দৈনিক তিনবার ভোগ করেছে সেই অসহ্য নরকযন্ত্রণা। ওরা প্রথম যখন এখানে আসে, সবাই নিশ্চয়ই সুস্থ-সমর্থ ও সাহসী মানুষ ছিল, কিন্তু ওই মাত্রা ছাড়ানো নৃশংস ব্যথা সহ্য করা কোন রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্যাসের মিহি স্প্রে পোড়ায় না বা কাটে না, আক্রমণ করে নার্ভে। একটা পর্যায়ে জ্ঞান হারাতে হয়। জ্ঞান ফেরার পর দেখা যায়, প্রাণশক্তি আগের চেয়ে অনেকটা কমে গেছে। এভাবে কমতে কমতে যে-টুকু অবশিষ্ট থাকে, মানুষটাকে দেখে মনে হবে জড় পদার্থে পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।

এ স্রেফ বর্বরতা। ঠাণ্ডা মাথায় অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে লোকগুলোর সঙ্গে। আশরাফ অনুভব করল, তার আঙুলগুলো এমনভাবে নড়ছে যেন এই মুহূর্তে পেনিফিদারের গলায় রয়েছে ওগুলো—পেনিফিদার, ক্রনেল বা পাইথনের। ওদেরকে খুন করার জন্যে তার ভেতর যেন একটা আগুন জ্বলে উঠল। সে জানে, ভাবাবেগের এই বন্যাটা সরে গেলেও ওদেরকে মৃত দেখতে চাওয়ার ইচ্ছেটা তার ভেতর থেকে যাবে, কারণ এ-ধরনের মানুষদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

পাশ থেকে তার কাঁধে হাত ছোঁয়াল সোহানা, শান্ত গলায় বলল, 'ওদিকে তাকাও—জেনি।' আশরাফের মন থেকে সমস্ত চিন্তা এক পলকে মুছে গেল। মনে হলো লম্বা গুহার সংলগ্ন আরেকটা অংশ থেকে বেরিয়ে এল জেনি, শেষ প্রান্তের ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আশরাফ, মুখে

কথা যোগাল না।

গলা চড়াল রানা, সাবধানে বলল, 'হ্যালো, জেনি।'

ওদের দিকে ছুটে এল জেনি, হাত দুটো লম্বা করে দিয়েছে সামনে। ঠোঁট সরু করে মৃদু শিস দিচ্ছে সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে গেল প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে, বেডে বসে পা দুটোকে মেঝের ওপর লম্বা করে রেখেছেন তিনি। ছুটে এসে সরাসরি রানার বাহুবন্ধনে ঢুকে পড়ল মেয়েটা।

জেনির চোখে পানি নেই, সারা শরীরে শুধু অদম্য একটা কাঁপুনি। হাঁপাচ্ছে সে, ভাঙা শব্দ বেরুল গলা থেকে। 'ওহ্, ওহ্ গড। রানা, তোমাকে ওরা মেরেছে? এ আমাকে কোথায় আটকে রেখেছে ওরা! কারও সাথে কথা বলতে পারি না, মানুষগুলোকে কিভাবে যেন বোবা করে রেখেছে—নড়াচড়া করে, কিন্তু যেন মরা!'

'লক্ষী মেয়ে, শান্ত হও,' জেনির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে রানা। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে জেনি, ওর বুকে কপাল ঘষছে।

'আজ রাতে ওরা যখন আমাকে বাইরে নিয়ে গেল, জানতাম না কি ঘটতে যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, তারপর প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেলাম...'

'ঠিক আছে, পরে শুনব, জেনি।'

রানার বুক থেকে মুখ তুলল জেনি, তার নাকের ফুটো কেঁপে উঠল, বাতাসের গন্ধ নিচ্ছে। এখনও কাঁপছে সে। 'তোমার সাথে সোহানা রয়েছে। সোহানা আর আশরাফ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্লেন ল্যান্ড করার আগে পর্যন্ত আমার ভয় হচ্ছিল আশরাফ বোধহয় বেঁচে নেই। সবাই তোমরা ওকে ভীতুর ডিম বলো, ভারি অন্যায়। জানো, সোহানার কটেজে আমার জন্যে কি করেছে ও? আমাকে প্যাসেজে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, মুখোমুখি হয় পাইথনের! চিন্তা করতে পারো? তোমরা সবাই ভাল আছ তো, রানা? প্লীজ, কিছু ঘটে থাকলে আমার কাছে লুকিয়ো না।'

'কবে আমরা তোমার কাছে কিছু লুকোতে পেরেছি?'

ফোঁপানোর মত আওয়াজ করে হেসে উঠল জেনি, দু'সেকেন্ডের জন্যে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল রানাকে, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে ছেড়ে দিয়ে হাতড়াবার ভঙ্গিতে একটা হাত লম্বা করল। 'আশরাফ?'

'তোমার সুদক্ষ দেহরক্ষী এদিকে,' বলে এগিয়ে এল আশরাফ, ধরা দিল জেনির বাহুবন্ধনে। 'সত্যি আমি দুঃখিত, ডার্লিং। পাইথনের সাথে আমার তুলনা হয় না।'

ক্ষমাপ্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই, বোঝাবার জন্যে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল জেনি, তারপর হঠাৎ করে তার চোখ দুটো ভরে উঠল পানিতে। চুপচাপ কাঁদছে সে।

'এই তো চাই, বোতলের ছিপি খুলে দাও,' বলে জেনিকে একপাশে টেনে নিয়ে এল আশরাফ, তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা ও অভয় দিচ্ছে। 'সবাই আমরা বেশ ভাল আছি, জেনি—সত্যি বলছি। বাকি সবার মত আমাদের ওপরও

নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করেছিল ওরা, যেভাবেই হোক প্রভাবটা আমরা এড়িয়ে গেছি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এ-ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে রানা বা সোহানার কাছে আবেদন জানাতে হবে তোমার।' আস্তিনসহ একটা বাহু জেনির মুখের কাছে উঁচু করল সে। 'নাও, চোখ মোছ। আমার রুমালটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ওরা।'

আবার খানিকটা হাসল জেনি, ফোঁত্ ফোঁত্ করে নাক টানল। 'আমার কাছে আছে একটা।' রুমাল বের করে চোখ-মুখ মুছল সে, নাক ঝাড়ল, তারপর সোহানার দিকে মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'আমাদের অবস্থাটা কি?' উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল আশরাফ, অনুভব করতে পেরে বাধা দিল জেনি, 'না, তুমি বানিয়ে বলবে। রানাও শুধু ভাল ভাল কথা শোনাবে। আমি সোহানার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে মুখ খুলল সোহানা, 'অবস্থা ভাল নয়, জেনি। তবে আরও খারাপ হতে পারত। এখনও আমরা কেউ আহত হইনি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এখুনি আমাদের কাউকে মেরে ফেলার কথা ভাবছে না পাইথন। কাজেই হাতে খানিকটা সময় পাব আমরা।'

'কি জন্যে সময় পাব?' দ্রুত জানতে চাইল আশরাফ। 'পালাবার, নাকি ওদেরকে শায়েস্তা করার?'

'হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই, আসলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি হবে?' বলল জেনি।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সোহানা, তারপর বলল, 'দু'জনের একটা ছোট দল হলেও একজন দলনেতা না থাকলে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। তোমরা রানাকে প্রশ্ন করো, সেই আমাদের নেতা।'

জেনি ও আশরাফ রানার দিকে ফিরল।

'প্রথম কাজ বেঁচে থাকা। এটাকে তোমরা পালানোও বলতে পারো।'

'ওদের এই ঘাঁটির বাইরে কয়েক শো মাইল শুধুই মরুভূমি, পালাব কিভাবে?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'সব কথা এখুনি ব্যাখ্যা করে বলা যাচ্ছে না। তবে কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে আমরা বহাল-তবিয়তে বের করে নিয়ে যাব এখান থেকে।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, উপলব্ধি করল ওর মুখের কথার সঙ্গে মনের চিন্তায় বিস্তর ফারাক। কথা দিচ্ছে রানা, তারমানে প্রাণপণ চেষ্টা করবে ও। যেমন সহজভাবে বলল, বেঁচে থাকার বা পালানোর কাজটা তত সহজ হবে না। উপায় একটা হবেই, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই সোহানার। উপায় একটা সব সময়ই থাকে। এর আগেও উষর মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে ও, রানার সঙ্গেই। দু'জনেই ওরা জানে, কৌশলগুলো জানা থাকলে মরুভূমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তবে আশরাফ আর জেনিকে নিয়ে সাহারা পাড়ি দেয়া ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা হবে। চিন্তা থেকে বিপজ্জনক শব্দটাকে বাদ দিয়ে রাখল সোহানা।

কিন্তু রানা শুধু আশরাফ আর জেনির কথা ভাবছে না। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন সহ তাঁর পুরো টীমটার কথা ভাবছে ও। ওদেরকে রক্ষা করা একটা নৈতিক

দায়িত্ব। তার মানে পালানোর কাজটা আরও কঠিন। ওরা কেউ সুস্থ বা সক্ষম নয়, কাজেই ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্যও পাওয়া যাবে না। চারদিকে একবার চোখ বুলাল রানা। এখানে কোথাও মিসেস হোয়াইটস্টোনও আছেন। বিছানায় যারা শুয়ে আছে কেউ তারা নড়েনি। আগের মতই বিছানার কিনারায় বসে আছেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন, পা ঝুলিয়ে। তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, আঙুল দিয়ে চিবুকটা ঘষছেন অনবরত, চোখ দেখে মনে হলো গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছেন। 'মিসেস স্টোন কোথায় বলতে পারো?' জেনিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদিকে,' হাত তুলে পিছন দিকটা দেখাল জেনি। 'শেষ মাথায়, আমাদের জন্যে আলাদা একটা জায়গা আছে। মিসেস স্টোন এখনও খানিকটা সুস্থ আছেন। কর্নেল তাঁকে মেমসাহিব বলে ডাকে। তাঁর ওপরও অত্যাচার হয়েছে, তবে খুব শক্ত বলে এখনও মাঝে মধ্যে কথা বলতে পারেন।'

জেনির একটা হাত ধরল রানা। 'চলো, তাঁর সাথে দেখা করে আসি। সবচেয়ে আগে দরকার তথ্য।' সোহানার দিকে ফিরল ও। 'বেশি লোক দেখলে উনি হয়তো ঘাবড়ে যাবেন, তোমরা বরং একটা বিছানায় বসো। চেষ্টা করে দেখ, কাউকে কথা বলাতে পারো কিনা।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, জেনিকে নিয়ে কমন রুমের শেষ প্রান্তের দিকে এগোল রানা।

ঘুরে দাঁড়াল আশরাফ, সোহানার পাশে চলে এল। 'যাক, অন্তত জেনিকে ওরা দাওয়াইটা দিচ্ছে না,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল সে।

'দিচ্ছে না, কারণ জেনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।'

চোখের ওপর একটা হাত ঘষল আশরাফ। অভিযোগের সুরে বলল সে, 'জেনিকে তুমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছ, ওকে দিয়ে ওরা কিছু করাবার চেষ্টা করেছে কিনা।'

'ভুলিনি,' বলল সোহানা। 'জেনি কি জানে না জানে যে-কোন সময় জেনে নিতে পারব আমরা। প্রথমে আমাদের পেতে হবে জেনি জানে না, এরকম একটন তথ্য। ক্যাম্প বেড়ে শুয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল ও। 'এসো, ওদেরকে কথা বলাবার চেষ্টা করি।'

বিছানাগুলোর দিকে এগোচ্ছে ওরা, বাইরে থেকে দরজার বার সরানোর আওয়াজ হলো। তাকাতেই দেখল, দরজাটা খুলে যাচ্ছে। ছোট একটা প্যাকেট ও ভাঁজ করা একটা চাদর নিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক। মাত্র এক সেকেন্ডের মত খোলা থাকল দরজাটা, চাঁদের আলোয় বাইরে একজন গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল আশরাফ, এক হাতে সাবমেশিনগান, দরজার দিকে তাক করা, অপর হাতে ছোট্ট একটা অ্যারোসল স্প্রে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বাইরে থেকে ব্রাকেটে ঢোকানো হলো বারগুলো। এতক্ষণে আগন্তুকের দিকে তাকাল আশরাফ। রাগে তার পিত্তি জ্বলে উঠল। এইমাত্র কমন রুমে ঢুকেছে বিল ওয়াটসন।

সোহানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল পাইলট। 'ভাল চাদর পেলে খুশি হও,

ম্যা'ম?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল সোহানা, আশরাফ দেখল থমথম করছে ওর চেহারা। আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওদেরকে পাশ কাটাল ওয়াটসন। একটা খালি বিছানার সামনে থামল সে, ভাঁজ খুলে চাদরটা বিছাল, প্যাকেটটা বিছানার মাথার কাছে রাখল, তারপর সেটায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা সিগারেট ধরাল সে।

হেঁটে এসে বিছানাটার এক ধারে দাঁড়াল সোহানা, তার পাশে আশরাফ। হাতের সিগারেট উঁচু করে ওদেরকে দেখাল ওয়াটসন, মাথা নাড়ল দু'জনেই। তারপর সোহানা জানতে চাইল, 'রাতে তুমি এখানেই ঘুমাও নাকি, ওয়াটসন?'

'শিওর। হয় এখানে, নয়তো ব্রুনেলের সাথে। গরিলাটা চায় না আশপাশে কেউ ঘুর-ঘুর করুক। কমন রুমটাই বেছে নিয়েছি আমি। ব্রুনেল লোকটা নাক ডাকে।' সিগারেটে টান দিল সে।

'তাহলে সেসনার ওপর নজর রাখে কে?' ওয়াটসন জবাব না দেয়ায় সোহানা আবার জিজ্ঞেস করল, 'সেসনায় ফুয়েল ভরা হয়েছে?'

চেহারায় অসন্তোষ, ওয়াটসন বলল, 'প্লীজ, ম্যা'ম।' বলতে চায়, এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নয় সে যাতে তার মনিবের স্বার্থহানি ঘটতে পারে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার কাছ থেকে সরে এল সোহানা, পিছু নিল আশরাফ। সামনে খালি তিনটে বিছানা দেখা গেল, তার একটায় বসল আশরাফ, ইঙ্গিতে পাশেরটা দেখিয়ে দিল সোহানাকে। 'তুমি ওই ব্যাটাকে কিছু বললে না কেন?' রাগে হিসহিস করে উঠল সে। 'তাহলে কিসের ট্রেনিং পেয়েছ তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম এই সুযোগে তুমি ব্যাটার ঘাড় মটকাবে।'

চেহারা দেখে মনে হলো না সোহানা অবাক হয়েছে। 'মটকাতাম, যদি দেখতাম তাতে কোন লাভ হবে।'

'মানে! ওই ব্যাটাই তো ফাঁদে এনে ফেলেছে আমাদের!'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'ফাঁদে আমরা নিজেরা এসে পড়েছি। ওয়াটসন শুধু আমাদেরকে সাবধান করেনি। সাবধান করার উপায় ছিল না তার, কারণ সে এক ধরনের সৎ লোক। সে তার মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত, যে তাকে টাকা দেয়। বড়জোর বলতে পারো, সততার নিজস্ব একটা সংজ্ঞা আছে তার।'

হতভম্ব হয়ে সোহানার দিকে তাকিয়ে থাকল আশরাফ। এক মিনিট পর কাঁধ ঝাঁকাল সে, বিছানা ছেড়ে হেঁটে এল প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের কাছে। 'আমি আশরাফ,' নরম সুরে বলল সে। 'আমরা সবাই আসলে খুব বিপদের মধ্যে আছি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো বলতে পারবেন ঠিক কি ঘটছে এখানে।'

তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন, তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমি ক্লান্ত? কত কাজ পড়ে আছে জানেন? আজ খাওয়ার সময় পাইনি, কাল তো দম ফেলারও সময় পাব না।' কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি, একটা চাদর টেনে নিয়ে মুখ লুকালেন।

ওদিকে ছোট কামরাটায় একটা বিছানার ওপর বসে রয়েছে রানা ও জেনি।

ওদের সামনে রোগা, অভিজাত চেহারার এক ভদ্রমহিলা। তাঁর হাড়গুলো চওড়া, রোদে পোড়া চামড়া হাড়ের ওপর টান টান হয়ে আছে। কাঁচাপাকা চুল মাথার পিছনে খোঁপা করা।

মিসেস হোয়াইটস্টোন আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কথা বলার চেষ্টা করছেন, যদিও কাঁপুনিটা থামাতে পারছেন না। 'আমি আমার স্বামীর জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এখন তো সে প্রায় কথাই বলতে পারে না। ওর জন্যে এটা একটা···,' তাঁর গলা কেঁপে গেল। '···এটা একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। আর বেচারা ছেলেগুলোরই বা কি অবস্থা করেছে ওরা! কত আগ্রহ নিয়ে এল ওরা, কি উৎসাহ এক-একজনের! সব ভূত হয়ে গেছে। শুরুতেই আমি ডেভিডকে বলেছিলাম, ড. জিমসনের কথায় রাজি হওয়া উচিত হচ্ছে না। মাস প্যাপিরাসের পাতা ক'টা অনুবাদ না করাটা অত্যন্ত বোকামি হয়েছে।'

জেনির দিকে তাকাল রানা, বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল সে, অর্থাৎ এ-প্রসঙ্গে তার কিছু জানা নেই। 'প্যাপিরাসে এমন কিছু ছিল,' জানতে চাইল রানা। 'যা প্রকাশ করা হয়নি?' ওর চেহারায় আগ্রহ।

'হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি! আমার স্বামীকে বোঝানো হয়েছিল, গারামান্টেস গুপ্তধনের একটা অংশ শুধু জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা হবে, কোন সরকারকে নিতে দেয়া হবে না, বা কোন মিউজিয়ামকেও দান করা হবে না। সেজন্যেই ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজি হয় ডেভিড।'

'গারামান্টেস গুপ্তধন?'

'হ্যাঁ। গারামান্টেস থেকে শুধু জুয়েল এসেছিল, অবশ্যই। সোনা, রূপো বা অন্য সমস্ত কিছু কয়েক বছর ধরে ডোমিটিয়ান মাস সংগ্রহ করেছিল। আমার স্বামীকে নিয়ে সত্যি আমি খুব চিন্তায় আছি। কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে সে···,' ধীরে ধীরে মিসেস হোয়াইটস্টোনের গলা নিস্তেজ হয়ে এল, তারপর একবারে থেমে গেল। নীল চোখে শূন্য দৃষ্টি, তাকিয়ে আছেন অথচ কিছু যেন দেখতে পাচ্ছেন না।

'উনি আর কথা বলবেন না,' শান্ত গলায় বলল জেনি। 'মাঝে মধ্যে কথা বলেন, তারপর হঠাৎ এরকম চুপ করে যান।'

বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল ওরা। বড় কামরাটায় ফিরে এল।

পাশাপাশি দুটো বিছানায় শুয়ে রয়েছে সোহানা আর আশরাফ, চুপচাপ। রানা আর জেনিকে দেখে উঠতে যাচ্ছে ওরা, রানা বলল, 'না, থাকো ওখানে।' সোহানার বিছানায় এসে বসল ও, দেখল এক ধারে সরে গিয়ে জেনিকে নিজের পাশে বসতে দিল আশরাফ। 'কাউকে তাহলে কথা বলাতে পারোনি,' বলল ও।

মাথা নাড়ল সোহানা। 'ওদের অবস্থা শোচনীয়, রানা।' চোখ তুলে এক সারি বিছানার দিকে তাকাল ও। 'এখানে আমাদের সাথে ওয়াটসনও রয়েছে।'

'কথা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'কাজটার জন্যে একুশ হাজার ডলার পাচ্ছে ও। আমি ত্রিশ হাজার অফার করেছি।' কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা।

হুঁ। ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ?'

'দুটো ল্যান্ড-রোভার আর একটা ট্রাক। শয়তানগুলো যেখানে থাকে তার পিছনে কোন টানেলে রাখা হয় ওগুলো। চাবি থাকে পাইথনের কাছে। সেসনাটাকেও অচল করে রাখা হয়। ওয়াটসনের ওপর নির্দেশ আছে, প্লাগ খুলে আনতে হবে। রাতে ওগুলো পাইথনের কাছে থাকে।' সোহানার শেষ কথাটা কেমন যেন শুকনো লাগল আশরাফের কানে, সূক্ষ্ম কোন সঙ্কেত যদি থেকেও থাকে, আশরাফ অর্থ করতে পারল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল রানা। সোহানাও কথা বলছে না। তবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আশরাফের মনে হলো, দু'জনই নিজেদের ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এই মুহূর্তে। নিজেদের মধ্যে অন্য এক স্তরে যোগাযোগ করছে রানা ও সোহানা, যে স্তরে মৌখিক ভাষার কোন প্রয়োজন হয় না। এভাবে যোগাযোগ করতে আগেও ওদেরকে দেখেছে আশরাফ, সেজন্যেই বুঝতে পারল, ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে ওরা, বিবেচনা করছে কি ধরনের তথ্য দরকার হবে ওদের, কিভাবে সেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। দুটো মনের মাঝখানে প্রায় টেলিপ্যাথিক একটা যোগাযোগ, আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে শুনে ফেলার কোন উপায় নেই।

আশরাফ আন্দাজ করল, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর হওয়ায় পরিস্থিতিটা টের পেয়ে গেছে জেনি। হাত দুটো কোলের ওপর রেখে সে-ও চুপচাপ বসে আছে, কেউ কোন কথা না বললেও মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে সে।

রানা বলল, 'গোটা ব্যাপারটা গুপ্তধন নিয়ে, সোহানা। পরিমাণে বিপুল, তবে উনি শুধু গারামান্টেস মণিমুক্তোর কথা বললেন।'

নরম সুরে সোহানা বলল, 'ওহ্ গড!'

তাড়াতাড়ি স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল আশরাফ। কেমব্রিজে কিছুদিন ইতিহাসও পড়েছে সে। গারামান্টেস?···হ্যাঁ, চোদ্দ শো শতকের দিকে গারামা নামটা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যায়। এখন জায়গাটার নাম জারমা, এখান থেকে প্রায় চারশো মাইল পুবে, ফেজান-এ। সেই প্রাচীন কালে, রোম যখন উত্তর আফ্রিকা শাসন করত, কর্নেলিয়াস বালবুস দক্ষিণ দিকে অভিযানে বেরিয়ে গারামান্টেস দখল করে নেন। গারামান্টেস ছিল আরও সামনের ঐশ্বর্যবহুল ব্ল্যাক আফ্রিকায় পৌঁছুনোর জন্যে সাহারার ওপর একমাত্র করিডর।

সোনা, রূপো, আইভরি, ক্রীতদাস···মণিমুক্তো? হ্যাঁ, অবশ্যই। 'গারামান্টেস-এর চুনি' নামে ছোট্ট একটা পরিচ্ছেদও পড়া আছে তার। সামান্য হলেও বিস্মিত হলো আশরাফ, প্রাচীন যুগের রক্ত ইত্যাদি সম্পর্কেও রানা ও সোহানা খবর রাখে নাকি! ওদের আলোচনা শুনে সেরকমই মনে হলো। অথচ বিষয়টা প্রায় পৌরাণিকই বলা চলে, ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য কোন রেকর্ড নেই। তারপর তার মনে পড়ল, সোহানার পেন্টহাউসে একটা লাইব্রেরি আছে।

হঠাৎ রানার একটা কথা শুনে কান খাড়া হয়ে উঠল আশরাফের।

'আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আছে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, কঠিন হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'অত্যন্ত গুরুতর। পরে ওটার একটা বিহিত করতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এল। অবশেষে খুক করে কেশে, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে হলো আশরাফকে, 'জেনি বোধহয় আশা করছে ব্যাপারটা কি নিয়ে তাকে বলা হবে। আর আমি বুঝি, আমার জানার অধিকার আছে।'

আশরাফের দিকে তাকাল রানা, মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'দুঃখিত, আশরাফ। আমরা স্যার ভিক্টর ক্যানিং সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল আশরাফ। 'স্যার ভিক্টর ক্যানিং? কই, নামটা তো আমি উচ্চারিত হতে শুনলাম না।'

'তার কথা ভাবছিলাম আমরা। টীমের লোকদের নিজে বাছাই করেছেন তিনি। বিল ওয়াটসনের কথা তিনি নিজেই আমাদেরকে বলেছেন।'

এক মুহূর্ত পর আশরাফ বলল, 'তো কি হলো?'

রানাকে বিস্মিত দেখাল। 'যার হাতে ছড়ি থাকে শুধু তার পক্ষে কাজ করে ওয়াটসন। আর কারও নয়।'

'সবার মাথার ওপর তো ছড়ি ঘোরাচ্ছে পেনিফিদার আর পাইথন।'

'না। ওদের মাথার ওপরও ছড়ি ঘোরাচ্ছে অন্য এক লোক—স্যার ক্যানিং। ওয়াটসনকে তিনি বাছাই করেছেন। তার সাথে আমার কি কথা হয় আমি তা সোহানাকে বলেছি, তুমি সোহানার কাছে শুনেছ।' চুপ করল রানা, যেন যতটুকু বলার প্রয়োজন ছিল সব বলা হয়ে গেছে।

আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা, বুঝিয়ে দেয়ার নরম সুরে বলল, 'ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারমানে হচ্ছে কেউ ওদেরকে জানিয়েছে আমরা আসছি। যে লোক ওদেরকে কথাটা জানিয়েছে সে-ই ওয়াটসনকে বলেছে কোথায় আমাদেরকে নামিয়ে দিতে হবে। কাজটা মাত্র একজনের পক্ষে করা সম্ভব। ভিক্টর ক্যানিং।'

'স্যার ভিক্টর ক্যানিং?' ব্যাপারটা হজম করতে পারছে না আশরাফ। 'কিন্তু···কিন্তু তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি! বিশাল একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্যের অধিপতি! জনহিতকর কাজে তাঁর মত সুনাম কারও নেই!'

'দান করার সামর্থ্য তার আছে,' ম্লান গলায় বলল রানা। 'এমন লোকের কথা শোননি, বই চুরি করে বেচে, টাকাটা ভিখারিকে দিয়ে দেয়? পার্থক্যটা আসলে ডিগ্রীর।'

হেসে ওঠার উন্মত্ত একটা ঝোঁক চাপল আশরাফের। সেটাকে দমিয়ে রেখে বলল, 'পার্থক্যটা ডিগ্রীর! আচ্ছা! কি জান, মাঝে মধ্যে ঠিক বুঝতে পারি না তোমাদের কৌতুকবোধ অসম্ভব গভীর, নাকি আমারই মাথা খারাপ।'

'ক্যানিং আমাদেরকে বলেছেন, রেডিও কমিউনিকেশনের জন্যে এই জায়গাটা একটা ডেড স্পট। পাইথনের কামরায়, যেখানে ওরা আমাদেরকে সার্চ করল,

একটা রেডিও আছে। তুমি দেখনি?'

চোখ বন্ধ করে সাবধানে বলল আশরাফ, 'হ্যাঁ, দেখেছি, তবে তাৎপর্যটা বুঝতে পারিনি। প্রকাশ্যেই রাখা হয়েছে, যেমনটি রাখা উচিত, সেজন্যেই মনটা খুঁত খুঁত করেনি।'

'ওটা সম্ভবত ক্যানিঙের সাথে ডাইরেক্ট লিঙ্ক,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ওই রেডিও থেকেই ওরা জানতে পেরেছে, আমরা আসছি।'

ধীরে ধীরে উপসংহারটা মেনে নিল আশরাফ। ড. জিমসন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলেছিলেন ভিক্টর ক্যানিংকে, ফলে পাইথনের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁকে। তারপর রানা উদয় হলো ক্যানিঙের সামনে, মন ভরা সন্দেহ নিয়ে, মাসে এসে তদন্ত করতে চায়। মনে মনে ভারি খুশি হলেন ভিক্টর ক্যানিং। এবার আর পাইথনকে পাঠাবার দরকার নেই, শিকারগুলোই তার কাছে যেতে চাইছে। 'বাট ফর গডস্ সেক, নিজেকে তিনি কোনভাবেই রক্ষা করতে পারবেন না! মারভিন লংফেলো জানেন আমরা এখানে আছি। সবাই জানেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন ও তাঁর টীম এখানে কাজ করছে। ক্যানিং যদি আমাদের সবাইকে খুনও করে ফেলেন, তাঁকে ধরা পড়তে হবে!'

'তাঁর ইচ্ছেও তাই,' বলল রানা, একটু যেন অন্যমনস্ক। 'পাইথনের ওপর তাঁর নির্দেশ আছে, জেনি গুপ্তধন খুঁজে পাবার সাথে সাথে সবাইকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু কেন বলছ, ধরা তাঁকে পড়তেই হবে? আমরা স্রেফ গায়েব হয়ে যাব। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল অথবা আগাথা ক্রিস্টির একটা মিস্টরি। কিংবা, পাথর ধসে আমরা চাপা পড়ে গেছি, এমন হতে পারে না? ক্যানিং ঠিকই বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচে যাবেন। কে তাঁকে সন্দেহ করবে?'

কথা বলল না কেউ। খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙল জেনি। 'দেখা যাচ্ছে গুপ্তধনটা আমার খুঁজে পাওয়া চলবে না।'

তার হাতে হাত রাখল আশরাফ। 'ওদেরকে তুমি বোকা বানাতে পারবে, জেনি?'

'মনে হয় পারব।' কমন রুমের নিস্তেজ আলোয় জেনির চেহারা ম্লান দেখাল। 'প্রতিদিন আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্যে খানিকটা করে জায়গা চিহ্নিত করে রেখেছে ওরা। প্রথম দিকে একটা করে বিরাট এলাকা পরীক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। মূল্যবান মেটাল খুঁজেছি, তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ক'দিন পর কিছুই আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে যে আমি ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছি না, এলাকা কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনে। এখন আমি আধ ঘণ্টায় যতটুকু সম্ভব পরীক্ষা করি, দিনে তিনবার।'

রানা জানতে চাইল, 'এভাবে গোটা মাস কাভার করতে কতদিন লাগবে?'

'এলাকাটা কত বড় দেখতে পাচ্ছি না আমি। তবে ব্রুনেল বলছিল আরও দশদিন লাগবে।'

রানা ও সোহানা পরস্পরের দিকে তাকাল। আবার যেন নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করল ওরা। খানিক পর রানা শুধু বলল, 'পাইথন।'

উত্তরে সোহানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

বিছানার ওপর ঝট করে উঠে বসল আশরাফ। 'পাইথন কি?' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল সে। 'তোমাদের নীরব আলোচনায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা না হয় নেই আমাদের, কিন্তু আমরা জানতে চাই ঠিক কি ধরনের বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। বলো, পাইথন কি?'

'পাইথনকে বাছাই করেছেন ক্যানিং,' বলল সোহানা, এখনও তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'গুপ্তধন মাটির তলা থেকে উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত সে-ই এখানে সবার বস্ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। পেনিফিদারকে আনা হয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে, তার দায়িত্ব গুপ্তধন এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করা।'

'না, রানা ঠিক এ-কথা বলতে চায়নি,' প্রতিবাদ করল আশরাফ।

'যা বলতে চেয়েছ, এ তারই একটা অংশবিশেষ। আমরা বুঝতে পারছিলাম না পেনিফিদার ও পাইথন কে কার অধীনে কাজ করছে। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই পর্যায়ের কাজের দায়িত্ব রয়েছে পাইথনের ওপর।'

'তো?'

'সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। যে-কোন কাজই তাকে দেয়া হোক, সেটা নিখুঁতভাবে করে সে, এবং তারপরও হাসি-তামাশার জন্যে প্রচুর সময় বের করে নেয়। জেনি এইমাত্র বলেছে, দশদিন। তারমানে এই নয় যে এখান থেকে পালাবার একটা উপায় বের করার জন্যে দশটা দিন সময় আছে আমাদের হাতে।'

রানার দিক থেকে আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। 'তার আগেই নিজেকে আনন্দদানের কাজ শুরু করবে পাইথন। ভেবে দেখ না, তা না হলে অন্য কি কারণে আমাদেরকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে?'

চার

মাথা ভাঙা পিলারটার গায়ে একটা তক্তা খাড়া করেছে কোর্সিনেজ। প্রাচীন কালে পাথুরে স্তম্ভশ্রেণীর একটা অংশ ছিল পিলারটা। তক্তার গায়ে, বিভিন্ন উচ্চতায়, সাদা চক দিয়ে বৃত্ত এঁকেছে সে। হাতে তীক্ষ্ণমুখ অসি, তক্তার ওপর খুদে টার্গেটগুলোয় আকস্মিক খোঁচা মারা প্র্যাকটিস করছে। কাজটা সে এক ঘণ্টার ওপর হলো ক্লান্তিহীন ভাবে করে যাচ্ছে।

পনেরো গজ দূরে একটা বোল্ডারের ওপর বসে রয়েছে একজন গার্ড, হাতে হালকন সাবমেশিনগান। অস্ত্রটা আর্জেন্টিনায় তৈরি, স্টক ভাঁজ করা যায়, ম্যাগাজিনে ত্রিশ রাউন্ড ৪৫-ক্যালিবার কার্টিজ। একদল লেবারের ওপর নজর রাখছে লোকটা, দলটায় সোহানাও রয়েছে। আর আছেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন ও আর্কিওলজিকাল টীমের তিনজন তরুণ। প্রাচীন নগরীর নেক্রোপোলিস অর্থাৎ

গোরস্থানে কাজ করছে ওরা।

সিকি মাইল দূরে আরেকটা দলের সঙ্গে কাজ করছে রানা ও মিসেস হোয়াইটস্টোন, দলে আর্কিওলজিকাল টীমের বাকি সদস্যরাও আছে। বিধ্বস্ত ছোট একটা মন্দিরের চারপাশটা খুঁড়ছে ওরা। কাছেই রয়েছে গোল একটা ধুলোময় ধ্বংসস্তূপ, এককালে সার্কাস বা অ্যারেনা ছিল। ভারি পাথর তোলার জন্যে কপিকল ব্যবহার করছে ওরা।

দুটো দলের মাঝখানে চিহ্নিত জমিনের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে জেনি। তার দুই হাতে একটা করে কপার টিউব ও স্টীল ওয়্যার দিয়ে বানানো লোকেটর। তার সঙ্গে, কনুইয়ের কাছে, সারাক্ষণ উপস্থিত রয়েছে পেনিফিদার। রোদ বলে মাথায় আজ একটা স্ট্র হ্যাট পরেছে পেনিফিদার, শার্টের আস্তিন কব্জি পর্যন্ত নামানো।

পাইথন মার্কাস বা আশরাফ চৌধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

গোরস্থানের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ব্রুনেল, লেবার পার্টির কাজ দেখছে। ঢোলা শর্টস পরেছে সে, মাথায় হেলমেট, গায়ে শার্ট নেই, কোঁকড়ানো জ্যাকেটটা খোলা। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর সে তার কালো নোট-বুকটা বের করল, যত্ন করে কিসে যেন টিক চিহ্ন দিল এক পাতায়, আরেক পাতায় সাবধানে কি যেন লিখল। গোছাল লোক ব্রুনেল, কাজকর্মে শৃঙ্খলা ভালবাসে, এই নোট-বুক তার কাছে বাইবেলের মত।

খাড়া করা তক্তার কাছ থেকে সরে এল কোর্সিনেজ, হাতে তলোয়ার। নিঃশব্দে হেসে ব্রুনেল বলল, 'স্টেজ থ্রী, সেকশন ফোর, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কাজ।'

'পাইথনকে আমি বুঝি না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কোর্সিনেজ। 'আন্দাজের ওপর নির্ভর করে খোঁড়াখুঁড়ি নেহাতই বোকামি হচ্ছে। অন্ধ মেয়েটা লোকেশন খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত আমাদের।'

'অথচ তুমি একজন সামরিক অফিসার!' হতাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রুনেল। 'বন্দীদের ব্যস্ত রাখার গুরুত্ব বোঝ না?'

'এই বন্দীদের?' কোর্সিনেজের গলায় তীব্র ব্যঙ্গ। 'তোমার বুঝি ধারণা মাসুদ রানা ওদের ঘুম ভাঙাবে, তারপর বিদ্রোহ করার জন্যে প্ররোচিত করবে?'

হেসে উঠল ব্রুনেল। 'তা হয়তো নয়।' সোহানার দিকে তাকাল সে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কঠিন মাটি থেকে শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে একটা পাথর আলগা করছে ও। 'তুমি যদি একা হতে বা রানা একা হত, রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম আমি, সুন্দরী। তোমরা দু'জন হওয়ায় আমার আরাম হারাম হয়ে গেছে।'

সোহানা কথা বলল না। কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কোর্সিনেজ, খুঁটিয়ে দেখল, তারপর মাটি ও পাথরের স্তূপ ডিঙিয়ে এগিয়ে এল। সোহানার হাতে শাবল রয়েছে, তবে সেজন্যে ভয় পাচ্ছে না। শুধু আত্মহত্যা করতে চাইলে ওটা ব্যবহার করবে ও। নিজে তো মরবেই, সঙ্গে আরও দু'একজনকে নিয়ে যাবে। বন্দীদের সব সময় দু'ভাগে আলাদা করে রাখা হয়,

একদলের ভাল আচরণের ওপর নির্ভর করে অপর দলের নিরাপত্তা। তাছাড়া, নিজের ওপর আস্থা আছে কোর্সিনেজের, তার হাতে তলোয়ার থাকলে দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না সে।

সোহানা তার দিকে তাকাচ্ছে না, নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

'শুনতে পেলাম তুমি নাকি ফেনসিং জানো? খুব নাকি ভাল খেলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কোর্সিনেজ।

মুখ তুলে তাকাল না সোহানা, হাতও থামল না। 'এক-আধটু পারি।'

'তাহলে আমার সাথে খেলবে তুমি,' বলার সুর আদেশের, কোর্সিনেজের মুখে হাসি নেই। 'আমার কাছে আরেকটা তলোয়ার আছে।'

সিধে হলো সোহানা। 'কার নির্দেশ মানতে হবে আমাকে? তোমার, নাকি পাইথনের?'

রাগে লালচে হয়ে উঠল কোর্সিনেজের চেহারা।

ব্রুনেল বলল, 'পাইথন বা পেনিফিদারের নির্দেশ মানবে তুমি, সুন্দরী। তবে কোর্সিনেজের প্রস্তাবটা ওদের পছন্দও হতে পারে। তোমাদের সংখ্যা একটা কমে কমাবার দরকার আছে। ভেব না কোর্সিনেজের সাথে দাঁড়াতে পারবে তুমি। দুনিয়ার সেরা ফেনসারদের একজন ও।' সোহানার শরীরে লোলুপ দৃষ্টি বুলাল সে।

'আমরা লড়ব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কোর্সিনেজ। 'লড়ব ফয়েল-এর রুলস অনুসারে। লাইটওয়েট মেইল দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেট আছে আমার কাছে, টার্গেট এরিয়া ঢাকার জন্যে ওটা তুমি পরতে পারো।'

কোর্সিনেজের দিকে তাকাল সোহানা, ভুরু দুটো সামান্য উঁচু করল। 'আর তুমি?'

ঠোঁট ফাঁক না করে হাসল কোর্সিনেজ। 'আমার কিছু লাগবে না, হাতের এই তলোয়ারই যথেষ্ট।'

ব্রুনেলের দিকে তাকাল সোহানা। 'আমাকে কি লড়তেই হবে?'

'হবে, শুধু যদি দৈত্য বা পেনিফিদার আপত্তি না করে।' কোর্সিনেজের জেদ লক্ষ করে কৌতুক বোধ করছে ব্রুনেল।

কাজ শুরু করার জন্যে ঘুরল সোহানা, তারপর দেখল প্রফেসর হোয়াইটস্টোন মাটিতে গাঁথা একটা পাথর থেকে আঙুলের কোমল স্পর্শে বালি সরাচ্ছেন। পাথরটার গায়ে নিওলিথিক আমলের একটা দৃশ্য খোদাই করা রয়েছে, কয়েকজন শিকারী হত্যা করছে একটা জিরাফকে। খাঁজগুলো কালের আঁচড়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে খোদাই করা হয়েছে ওগুলো, সাহারা যখন উর্বর বনভূমি ছিল। পাথরটার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন প্রফেসর, আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তিনি, তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা, নরম সুরে বলল, 'ওটা আপনি আরেকদিন পরীক্ষা করবেন, প্রফেসর। এখন আমাদের সবাইকে মাটি খুঁড়তে হবে।'

মুখ তুলে তাকালেন তিনি, চেহারায় বিমূঢ় ভাব। তারপর লক্ষ করলেন, কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রুনেল ও কোর্সিনেজ। কোটরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া চোখ

দুটোয় আতঙ্ক ফুটে উঠল, মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি শাবলটা তুলে নিলেন পাশ থেকে। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। খুঁড়তে হবে।' তাঁর গলা অত্যন্ত চড়া ও কাঁপা কাঁপা। তরুণ তিনজনের দিকে তাকালেন তিনি। 'খুঁড়ুন, জেন্টলমেন!'

তাদের একজন অলসভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, চোখে সামান্যতম কৌতূহলও নেই। বাকি দু'জন তাঁর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

খিক খিক করে হাসল ব্রুনেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে অপর দলটার দিকে এগোল। কোর্সিনেজ, তার ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে আছে, নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে আবার প্র্যাকটিস শুরু করল।

শাবল রেখে কোদাল দিয়ে আলগা মাটি ও পাথর তুলল সোহানা একটা হুইলব্যারো-তে। আজ নিয়ে তিনদিন হলো এখানে বন্দী ওরা, হতাশার কালো ছায়া ডানা মেলার চেষ্টা করছে দেখে শুরুতেই সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে ও। গত ষাট ঘণ্টায় অনেক কিছু জানতে পেরেছে ওরা, কিন্তু কোন তথ্যই ওদেরকে পালানোর রাস্তা দেখাতে পারেনি।

রানা ও সোহানা সাবধানে গার্ডদের পরীক্ষা করে দেখেছে। না, ওদেরকে ঘুষ দেয়া সম্ভব নয়। একে একে আটজন আলজিরিয়ানকেই দেয়া হয়েছে প্রস্তাবটা। কারও আগ্রহ নেই। অনির্ধারিত একটা সময়ে টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখতে রাজি নয় তারা। সবচেয়ে বড় কথা, পাইথনকে তারা যমের মত ভয় পায়। প্রস্তাবটার কথা আজ সকালে তারা তাকে বলেও দিয়েছে। শুনে ভারি কৌতুক বোধ করেছে পাইথন। হাসতে হাসতে নির্দেশ দিয়েছে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে আরেকবার ওদের তিনজনের যত্ন নিতে হবে। তিনজন মানে রানা, সোহানা আর আশরাফ।

বিষয়টা নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল সোহানা। তারমানে আবার একবার অজ্ঞান করতে হবে আশরাফকে। এ-ব্যাপারে রানাকে সাবধান করার দরকার নেই, তবু একবার করবে ও। ক্যারটিড-এ বেশিক্ষণ চাপ দিলে আশরাফের ব্রেনে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

হুইলব্যারোটা ভরে গেছে। উঁচু-নিচু জমিনের ওপর দিয়ে টেনে আবর্জনার স্তূপের কাছে নিয়ে আসছে ওটাকে, মন্দিরের পাশেই। আবর্জনার ওই স্তূপটার ভেতরও আর্কিওলজিকাল গুপ্তধনের টুকিটাকি অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, যেমন—হাড়ের বড়শি, পাথর ঘষে তৈরি করা তীরের মাথা, হাঁড়ি-বাসনের টুকরো, কুঠারের ভাঙা মাথা। আরও আছে, পরবর্তী সময়ের, রোমান ঢাল-এর ওপরের অংশ, ছুরির ফলা, রোমান তরোয়ালের তীক্ষ্ণ ডগা ইত্যাদি।

উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় ধীর পায়ে হাঁটছে জেনি, লোকেটর দুটো দু'হাতে ধরে আছে। মেয়েটির জন্যে করুণা বোধ করল সোহানা। জেনিই ওদের জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। গুপ্তধন খোঁজার এই কাজটা তার নার্ভের ওপর সাংঘাতিক চাপ সৃষ্টি করছে। তবে রাতের বেলা, ওরা সবাই যখন এক হয়, তাকে দেখে মনে হয় না নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হতে যাচ্ছে সে। কখনও রানার বিছানায় বসে সে, কখনও আশরাফের, তবে বেশিরভাগ সময়

চুপচাপ থাকে।

সোহানা ভাবল, জেনি বোকা নয়। সে জানে, প্রয়োজন ফুরালে ওদেরকে মেরে ফেলা হবে। খুশির কথা হলো, নিজের ভেতর একটা পাঁচিল তুলে দিয়ে মৃত্যুচিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সে, পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। রানার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, তবে দুর্বল সে আশরাফের ওপর। আশরাফের কৌতুক দারুণ উপভোগ করে মেয়েটা। আশরাফের কথা ভেবে আপনমনে হাসল সোহানা। জেনিকে হাসাবার জন্যে কত কি-ই না করে সে—মাঝে-মধ্যেই কৃত্রিম বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ছে, একদল শিয়ালের মাঝখানে হঠাৎ যেন এসে পড়েছে একটা বোকা ভেড়া। আবার কখনও কাপুরুষ হবার ভানও করে। এ-সবই হাসির খোরাক যোগায় জেনিকে, গুরুতর বিপদের কথা ভুলে থাকতে সাহায্য করে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, আশরাফকে ভালবাসতে শুরু করেছে জেনি।

খালি হুইলব্যারোটা ফিরিয়ে আনল সোহানা, তুলে নিল শাবলটা। রানার কথা ভাবল সে, পরমুহূর্তে ভয়ের হিমশীতল একটা ছোঁয়া অনুভব করল হৃৎপিণ্ডে। এই মুহূর্তে একা শুধু রানাই সবচেয়ে বেশি বিপদে রয়েছে। আপাতত আর কারও ওপর নয়, একা শুধু রানার ওপর নজর রয়েছে পাইথনের। সময় নিয়ে, প্রতিটি প্রলম্বিত মুহূর্ত উপভোগ করছে, রানার সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধের একটা ক্ষেত্র তৈরি করছে পাইথন। একমাত্র রানাকেই সে তার ব্যক্তিগত শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করছে। ওকে খুন করে বিপুল আনন্দ পাবে সে।

আমি সোহানা, রানাকে আমি রক্ষা করব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ও। কিন্তু কিভাবে?

পাইথনের মধ্যে হাস্যরসের কোন অভাব নেই। সুযোগ পেলেই রানাকে ব্যঙ্গ করছে সে, খোঁচা মেরে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে তিক্ত অতীতের কথা; তার হাসির মধ্যে থাকছে তীব্র অপমান ও চ্যালেঞ্জ।

গতকাল মাটিতে গাঁথা একটা বড় পাথর তোলার চেষ্টা করছিল রানা। একজনের পক্ষে পাথরটা তোলা সম্ভব নয়, কমপক্ষে তিনজন লাগার কথা। ভারি পাথর তোলার সরঞ্জামগুলো অন্য জায়গায় কাজে লাগানো হয়েছে দেখে রানা একাই চেষ্টা করে দেখছিল তুলতে পারে কিনা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল পাইথন, তারপর ট্রেঞ্চে নেমে এসে অবলীলায় এক হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলল পাথরটা, রানার মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। সবাই তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল, এমন কি রানার চোখেও নগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখেছে ওখানে যারা উপস্থিত ছিল। তারপর রানার দিকে ফিরল পাইথন, সহাস্যে বলল, 'বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা কোরো না, বুঝলে। তুমি আহত হলে আমাদের কাজ পিছিয়ে যাবে, সেটা আমি বরদাস্ত করব না। মনে থাকে যেন।'

ঘটনার সময় ওখানে সোহানা ছিল না, পরে আশরাফের মুখ থেকে শুনেছে। বলার সময় উদ্বেগে থমথম করছিল আশরাফের চেহারা। পাইথনের হাতে রানা অতীতে একবার মার খেয়েছে, এ-কথা তার জানা নেই, তবু তার মনে হয়েছে

অশুভ কি যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে।

এত কিছুর পরও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে রানা। সেজন্যে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল সোহানা। পাইথনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নীরবে হজম করছে রানা, অপমান ও চ্যালেঞ্জ গায়ে মাখছে না, ওকে যা করতে বলা হচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায়, পাইথন সম্পর্কে ওর কি ধারণা। এই মুহূর্তে পাগলটাকে ঘাঁটাবার কোন ইচ্ছে ওর নেই। জানে, কৌশল ছাড়া তার সঙ্গে কোনভাবেই পারবে না ও। এখন যদি লড়তে বাধ্য হয়, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে রানা, তার মানে হলো হাল ছাড়েনি। জেনি আর আশরাফের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে ও, প্রফেসর আর তার টীমের সদস্যদের সঙ্গে নরম আচরণ করে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সোহানার সঙ্গে পরামর্শও চালিয়ে যাচ্ছে। তবু বোঝা যায়, খুবই চিন্তায় আছে রানা।

সোহানার মত রানাও জানে, দশ বছর আগের অসমাপ্ত কাজটা এখন সমাপ্ত করার কথা ভাবছে পাইথন। যেভাবে শুরু করেছিল, ঠিক সেভাবেই শেষ করতে চায় সে, লাথি মেরে ধীরে ধীরে হত্যা করবে রানাকে। পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিয়েছে রানা, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে না পারলে ঘটনাটা ঘটবেই। কাজেই বিপদের কথা ভুলে কিভাবে পালানো যায় তাই নিয়ে পরামর্শ করছে সোহানার সঙ্গে, সুযোগ পেলেই।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উপায় দেখতে পায়নি ওরা। অথচ আজ তিনদিন পেরিয়ে যাচ্ছে।

মাটিতে শাবলের একটা ঘা মারল সোহানা। তলপেটের মোচড় অসুস্থ করে তুলছে ওকে। ভাবল, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত। শো-ডাউন স্থগিত রাখতে বিরাট সাহায্য করছে আশরাফ। পাইথনকে নিয়মিত হাসির খোরাক যোগাচ্ছে সে, কাজটা করছেও দক্ষতার সঙ্গে। নিজেকে রাজ-দরবারের একটা ভাঁড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে, ভীত-সন্ত্রস্ত ও মোটা বুদ্ধির এক লোক, তবে আচরণে খানিকটা আভিজাত্য ও সংস্কৃতির ছাপ বজায় রাখছে—পাইথনকে নাড়াচাড়া করার জন্যে আদর্শ একটা হাতল।

সোহানা ভাবল, এই অভিনয় কতক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে আশরাফ।

দূরে তাকাল ও, দেখল পেনিফিদারের সামনে থেমে আলাপ করল ব্রুনেল, তারপর নোট-বুকে কি যেন লিখল। মাথা ভাঙা পিলারের কাছে এখনও অক্লান্তভাবে প্র্যাকটিস করে চলেছে কোর্সিনেজ।

একটা চিন্তা এল সোহানার মাথায়। রানাকে বাঁচাবার একটা উপায় যেন আছে কোথাও, ঠিক ধরা দিচ্ছে না। পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। ব্রুনেল আর তার নোট-বুক; প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর নিস্তেজ আর্কিওলজিকাল টীম; কোর্সিনেজ আর তার তলোয়ার; বিল ওয়াটসন আর তার সেসনা; গ্যাস চেম্বারে কাপড় খুলে সার্চ করার সময় ব্রুনেল ওর গায়ে হাত দিয়েছে; পাইথন আর রানা।

আইডিয়াটা অবয়ব পেতে শুরু করল সোহানার মনে। পাইথনকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে একটা ডাইভারশন দরকার, তার দৃষ্টি যাতে রানার ওপর থেকে সরে যায়।

সোহানা উপলব্ধি করল স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, কোন কিছু দেখছে না; তাড়াতাড়ি আবার কাজ শুরু করল ও। উত্তেজনা ও উদ্বেগের শেষ চাপটুকুও স্নায়ু ও পেশী থেকে দূর হয়ে গেল, সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর পর শীতল শান্ত ভাব ফিরে এসেছে মনে। অন্ধের মত হাতরানোর সময় পেরিয়ে এসেছে ও, চমৎকার একটা চাল দেয়ার সুযোগ দেখতে পাচ্ছে।

ছকটা সাবলীলভাবে আঁকা হয়ে যাচ্ছে ওর মনে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বারবার। সাজানোয় কোন ভুল নেই, তবে একটা ঘুঁটি পাওয়া যাচ্ছে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘুঁটি। অবশ্য খেলা শুরু হলে সেটা নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে। পানির বোতলটা নিতম্বে ঝুলছে, সেটা মুখের কাছে তুলে দু'ঢোক খেল ও। প্রতিদিন কাজের বিরতির সময় দশ পাইন্ট করে পানি পায় বন্দীরা, বাকি পাঁচ পাইন্ট দেয়া হয় সন্ধের দিকে, ক্যানে ভরে।

বোতলে ছিপি লাগিয়ে ছকটা আরেকবার পরীক্ষা করল সোহানা। ব্যাপারটা রানার পছন্দ হবে না। সেজন্যেই ওকে কিছু বলবে না সোহানা। আমি সোহানা, ভাবল ও, বুঝতে পারছি রানার সামনে মহা একটা বিপদ ওত পেতে রয়েছে, কাজেই আমার প্রথম কাজ ওকে রক্ষা করা। ব্যাপারটা পছন্দ করবে না আশরাফও, সে সাংঘাতিক ভয় পাবে, রেগেও যাবে। ওরা যাতে ওকে বাধা দিতে না পারে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে প্রথমেই একটা চাল দেবে সোহানা, ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করলে ওদের কারও আর কিছু করার থাকবে না।

প্লাস্টিকের বড় প্লেটটায় উঁচু স্তূপ হয়ে আছে খাবার। সবই ক্যান-এর খাবার, রাখা হয় দু'হাজার বছর আগে বানানো শীতল পাথুরে ট্যাংকের ভেতর। প্লেটটা সাবধানে পাইথনের সামনে নামিয়ে রাখল আশরাফ। নামিয়ে রাখার সময় ছুরিটা ওর হাতের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে এল। ইচ্ছে করলেই ওটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে পাইথনের গলায় বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে সে। কিন্তু চেষ্টাটা ব্যর্থ হবে। পাইথনের অন্যমনস্ক ভাবটা দারুণ সন্দেহজনক। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছে, আশরাফ এরকম একটা সুযোগ বোধহয় হাতছাড়া করবে না। চেষ্টা করলে তার পরিণতি কি হবে আন্দাজ করতে পারল আশরাফ। হাতির পায়ের মত মোটা ওই দুই হাত দিয়ে তার কনুই ও কব্জি মট মট করে ভেঙে ফেলবে পাইথন।

পিছু হটল আশরাফ, ঠোঁটে ব্যগ্র হাসি ফুটিয়ে জানতে চাইল, 'সব ঠিক আছে তো?'

'কখনও যদি কিছু ঠিক না থাকে,' বলল পাইথন, তুলে নিল ছুরি আর ফর্ক, 'ধরে নিতে পারো কোন না কোনভাবে তোমাকে আমি ঠিকই জানাব।' ইঙ্গিতে একটা ফোল্ডিং ক্যানভাস চেয়ার দেখাল সে। 'বসো।'

প্রচুর খায় পাইথন, প্রায় পাঁচজনের খাবার একা, কিন্তু গোগ্রাসে গেলে না,

খায় ধীরে ধীরে। খাওয়ার সময় আশরাফ সামনে থাকলে মজা পায় সে। আশরাফ তাকে হাসির খোরাক যোগায়।

'তুমি হয়তো লক্ষ করে থাকবে,' খোশ-আলাপের সুরে বলল পাইথন। 'আমি যখন দাঁড়াই, আমার হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছাড়িয়ে যেতে চায়। ব্যাপারটা তোমাকে কিসের কথা মনে করিয়ে দেয়, বলো দেখি, আশরাফ?'

ব্যাকুল দেখাল আশরাফকে, খানিকটা সন্ত্রস্তও। এরকম দেখানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চেহারায় এ-সব ফুটিয়ে তোলা তার জন্যে তেমন কঠিন নয়। পাইথনকে সঙ্গে নিয়ে রশির ওপর দিয়ে হাঁটছে সে, ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই ভীতিকর একটা ব্যাপার। 'মনে করিয়ে দেয়,' এমন সুরে বলল সে, যেন স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। 'মনে করিয়ে দেয়···একজন অ্যাক্রোব্যাট-এর কথা।'

'সত্যি?' উৎফুল্ল দেখাল পাইথনকে। 'কেন?'

'কেন তা ঠিক বলতে পারব না,' গলায় সামান্য বেপরোয়া ভাব আনল আশরাফ। 'আমার ধারণা রশি ধরে ঝোলাঝুলি করলে মানুষের হাত লম্বা হয়।'

'ব্যাপারটা তোমাকে মানুষ আকৃতির কোন পশুর কথা মনে করিয়ে দেয় না, এই যেমন ধর গরিলা?' পাইথনের কুৎসিত মুখে গাল ভরা হাসি।

'জেসাস, নো!' তাড়াতাড়ি বলল আশরাফ। দম ফেলার জন্যেও থামল না সে, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে এমন ভাব দেখাল যেন তার চিন্তাজগতে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে, 'বলছিলাম কি, টুয়ারেগদের সম্পর্কে জানেন আপনি? ওরা যে-কোন বয়সের মেয়েদের সঙ্গে জোট বাঁধে, কেউ কোন প্রশ্ন তোলে না। দ্য ফাউকল্ড নামে এক লোক ছিল, নিজেদের তামাহক ভাষায় একটা অভিধান লেখে সে। জানেন, তাতে কৌমার্য বলে কোন শব্দই রাখা হয়নি? নৈতিকতার ধারণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।'

'এ-ধরনের প্রবণতায় সম্পূর্ণ সায় আছে আমার,' বলল পাইথন, খাবার চিবানোয় কোন বিরতি নেই। 'তুমি ঠিক জানো, আমাকে দেখে পরিলার কথা মনে পড়ে না তোমার?'

তিন দিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আঙুল ঘষল আশরাফ। 'না।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে। 'তবে ব্রুনেলকে দেখে মনে পড়ে। ছোট, ব্যস্ত একটা গরিলা।'

হাসির ধমকে ঝাঁকি খেল পাইথন, ভেজা ভেজা বাম চোখটা মুছল। 'তুমি হলে গিয়ে আপাদমস্তক সতর্ক মানুষ, আশরাফ। বিপদ সম্পর্কে ভারি সাবধান।'

আশরাফ মুছল তার ভুরু। স্বস্তির হাসি দেখা গেল মুখে, তবে কথা বলল না। মাছিগুলো তার মুখের চারপাশে ভনভন করছে। গরম আর তেষ্টার চেয়েও খারাপ এগুলো, এমনকি মাঝে মধ্যে উন্মাদ করা ভয়ের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। ওগুলোকে তাড়াবার জন্যে সারাক্ষণ হাত ঝাপটাচ্ছে সে। পাইথন অবশ্য তাড়ায় না। তার প্রকাণ্ড মুখে অবাধে ঘুরে বেড়ায় মাছিগুলো, ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সে যেন এতটুকু সচেতন নয়।

'অল্প বয়সে আমি যখন কলেজে পড়ছি,' স্মৃতি রোমন্থনের সুরে বলল পাইথন।

'সবাই আমাকে কিং কং বলত। ব্যাপারটা আমি একেবারেই পছন্দ করতাম না।'

চেহারায় এমন কৌশলে আহত ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলল আশরাফ, দেখে যাতে মনে হয় এটা তার ভান।

'পছন্দ করতাম না বললে আসলে কিছুই বলা হয় না,' মুখে উৎফুল্ল হাসি, খেতে খেতে বলে চলেছে পাইথন। 'রাগে আমার সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠত। আমি যে দেখতে কুৎসিত, এ-কথা বলতে দ্বিধা করত না কেউ। বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, আশরাফ, কুৎসিত বলে নিজের ওপর ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত আমার।' হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। 'তারপর কি হলো, জানো? জানো, কি আবিষ্কার করলাম আমি?'

'কি আবিষ্কার করলেন?' কৌতূহল প্রকাশ করেই গম্ভীর হয়ে উঠল আশরাফ।

'আবিষ্কার করলাম বরং বুদ্ধিমানই বলা যায় আমাকে, আশপাশে যাদেরকে দেখতে পাই তাদের সবার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমি, এবং আমার ভেতর অসহায়বোধ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ব্যথার নরম স্নায়ুগুলোকে ঘিরে রেখেছে মোটা চামড়ার আবরণ, ফলে কোন কিছুতেই আমি ব্যথা পাই না। এর বোধহয় একটা মেডিকেল টার্মও আছে।'

সামান্য হতভম্ব দেখাল আশরাফকে। 'হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করতে পারেন না। আপনি আসলে প্রথম থেকেই জানতেন। ব্যথা অনুভব না করার প্রসঙ্গে বলছি।'

'হ্যাঁ, জানতাম। তবে আমার কুৎসিত চেহারা ব্যাপারটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে দেয়নি আমাকে। কাজেই আমার কাছে ব্যাপারটা আবিষ্কারের মতই ছিল।' চেয়ারটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাল, শব্দ না করে হাসছে পাইথন। 'আমার ছ'জন সহপাঠি সিদ্ধান্ত নিল, কিং কংকে খোঁচাবে। গোটা ব্যাপারটা বীভৎস একটা চেহারা পেয়ে যায়। দেখলাম, কিছুই আমাকে করতে হলো না, শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা বাদে। তাতেই গুরুতরভাবে আহত হলো ওরা। অথচ আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। এমন নয় যে ওরা ওদের সাধ্যমত লড়েনি। শেষ পর্যায়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সন্দেহ নেই।'

'তারপরই ব্যাপারটার তাৎপর্য ধরা পড়ে গেল আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, তারপরই। আমার কদর্যতা শুধু চেহারার মধ্যেই নিহিত নয়। তার শিকড় আরও অনেক গভীরে। ব্যথা অনুভব না করা ছাড়াও, এমন সব আঘাত এত বিপুল পরিমাণে সহ্য করতে পারি আমি যে তার সিকি ভাগ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অন্য কোন মানুষের নেই—তার আগেই হয় জ্ঞান হারাবে তারা, নয়ত মারা যাবে।' ঠোঁট মুড়ে হাসল পাইথন। 'রানা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে, বছর কয়েক আগে।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। তার একটা সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চিত হলো সে। সত্যিই তাহলে অতীতে একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল রানা ও পাইথন।

'আমি আরও বুঝতে পারি,' বলে চলেছে পাইথন। 'আমার মনটাও আর সবার চেয়ে আলাদা। মেয়েমানুষ, মদ, ড্রাগ, এসবের কোনটারই কোন অ্যাডিকটিভ

এফেক্ট আমার ওপর নেই। বাঁধা না পড়ার সামান্যতম ভয় ছাড়াই এ-সব আমি ব্যবহার করতে পারি।' আশরাফের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসল সে। 'কাজেই আমি বদলে গেলাম। বলা যায়, প্রায় আমূল।'

এক মুহূর্ত পর মিনমিন করে, যদিও অনুমোদনের সুরে, বলল আশরাফ, 'নিজকে চিনতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। তারপর থেকে নিজের ওপর আপনার আর কোন ঘৃণা থাকল না, কেমন?'

'ঘৃণা তো থাকলই না, বরং শ্রদ্ধা এসে গেল।' হাসল পাইথন। খাবারের শেষটুকু মুখে পুরল সে। চিবিয়ে ঢোক গেলার পর খুশি মনে বলল, 'শুধু মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণটা একটা পর্যায় পর্যন্ত থেকেই গেল আমার ভেতর। আগে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতাম, অর্থাৎ আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল; এখনও মৃত্যুর কথাই ভাবি, তবে নিজের নয়, এই যা পার্থক্য। সত্যি কথা বলতে কি, মৃত্যু আমাকে টানে। মানুষকে মরতে দেখলে আমার ভাল লাগে। মানুষের মৃত্যু ঘটাতে ভালবাসি আমি। এবার বলো, আমার কাহিনীটা দারুণ ইন্টারেস্টিং নয়?'

'ইয়ে···মানে···,' খিক খিক করে হাসল আশরাফ। 'ব্যাপারটা সামান্য হলেও উদ্বেগজনক।'

'তুমি ভারি চতুর লোক। তোমার জন্যে ব্যাপারটা আসলেও উদ্বেগজনকই বটে।' ছুরি আর কাঁটা-চামচ রেখে চেয়ারে হেলান দিল পাইথন, অদ্ভুত এক অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আশরাফের দিকে।

পা গরম হয়ে উঠল আশরাফের, তেষ্টা পেল, ভয় লাগল—চেহারায় এ-সব প্রকাশ পেতে দিল সে। কাল লাঞ্চের সময়ও এরকম একটা অধিবেশনে পাইথনের সঙ্গে বসতে হয়েছিল তাকে। সেটা এখনকার চেয়ে অনেক সহজ ও নিরাপদ ছিল, কারণ সময়টা বেশিরভাগই ব্যয় হয়েছিল ফটোস্ট্যাট করা কয়েকটা কাগজ পড়ে। অনূদিত মাস প্যাপিরাসের হারানো পাতা থেকে করা। মাসে কি বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন লুকানো আছে, আশরাফের কাছে তা প্রকাশ করে দিয়ে ভারি পুলক ও আনন্দ লাভ করেছে পাইথন। ওগুলো পড়ে শোনাবার পর বলেছে, গুপ্তধনের পরিমাণ এত বেশি হওয়ার কারণেই তার পক্ষে কোন সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ কেউ বেঁচে থাকলেই দুনিয়ার লোককে সব কথা বলে দেবে।

অনুবাদ করা অংশটা মুখস্থ করে রেখেছে আশরাফ।

'···অতএব, আমি, ডোমিটিয়ান মাস, রোমের একজন শাসক, ফেবিয়াস-এর পুত্র, নুমিডিয়া-র একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দেহরক্ষী নিয়ে আফ্রিকা নোভা ছাড়িয়ে অজানা দেশে অভিযানে বেরুলাম এবং দক্ষিণের রাজকুমারীর কথা জানতে পারলাম, যিনি ওই এলাকায় বসবাসরত আউরিঘা জাতিকে শাসন করেন। কোন কোন জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো আমার, আমার বাবা ফোবিয়াস সেই উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন। এলাকাগুলো বেশিরভাগই খালি ও অনুর্বর, অথচ দু'এক জায়গায় মাটি ফুঁড়ে প্রচুর পানি বেরিয়ে আসে, ফলে গাছপালা জন্মায়···'

অভিযানের তৃতীয় বছরে বার্বার জনগোষ্ঠীর একটা উপজাতির সাক্ষাৎ পায় মাস, গোটা একটা উপত্যকা জুড়ে বসবাস করছে তারা। পরে এই উপত্যকাটা

তার নামে পরিচিতি পাবে। উপজাতির সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করে সে, তার ভাষায় যাকে দক্ষিণের রাজকুমারী বলা হয়েছে। তারপর দ্রুত, রোমান দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে, এলাকায় নিজের একটা খুদে সাম্রাজ্য স্থাপন করে ডোমিটিয়ান মাস। দক্ষিণ থেকে ক্রীতদাস আনা হলো, নতুন ঈশ্বরদের নাম ও গুণ প্রচার করা হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো রোমান প্রশাসন।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। বাবার আকাঙ্ক্ষা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পূরণ করার চেষ্টা করল যুবক মাস। তার বাবা নুমিডিয়া প্রদেশের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করার সময় নিজেদের জন্যে একটা ঠিকানা খুঁজে পাবার পরিকল্পনা করছিলেন। এ ব্যাপারে বাবার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল মাসের। এক পর্যায়ে নিজেদের জন্যে ঠিকানা খোঁজার দায়িত্বটা বাবার বদলে ছেলের কাঁধে চাপল, পদোন্নতি পেয়ে তার বাবা রোমে বদলি হয়ে যাওয়ায়।

তারপর, পরবর্তী দশ বছর ধরে, আফ্রিকা চষে যেখানে যত মূল্যবান সম্পদ ও সামগ্রী পেয়েছেন, ক্যারাভানের সাহায্যে সবই ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেবিয়াস। বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী মানুষের জন্যে লুঠপাট করার সুযোগ সব সময়ই থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিরা ফেজান, মৌরিতানিয়া প্রভৃতি আফ্রিকান শহরগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছিলেন, সেগুলোর বেশিরভাগই ফেবিয়াসের মাধ্যমে রোমে পৌঁছুনোর ব্যবস্থা করা ছিল। কিন্তু তা পৌঁছায়নি।

ফেবিয়াস আততায়ীর হাতে মারা যান। ছেলে মাস সিদ্ধান্ত নেয় যেখানে আছে সেখানেই থাকবে সে, লম্বা রোমান হাতের নাগালের বাইরে। পাথুরে শহরের নিচে কোথাও দু'হাজার বছর ধরে পড়ে আছে তাদেরই সেই বিপুল গুপ্তধন।

জীবনের শেষ দিকে গুপ্তধনের একটা তালিকা তৈরি করে মাস। তালিকায় সোনা ও রূপো ছিল, ছিল মুদ্রা, প্লেট, বার্বার জাতির মৃৎশিল্প, অলঙ্কার, আইভরি, অ্যান্টিকস, অস্ত্র বা হাতিয়ার, ঢাল ও তলোয়ার, সোনার বাসন, রত্নখচিত রূপোর অলঙ্কার আর মূল্যবান পাথর। তালিকায় গারামান্টেস পাথর সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। '···অত্যন্ত খাঁটি চুনি পাথর, এবং আকারে সেগুলো এত বড় যে দু'হাত এক করা অবস্থায় একজন মানুষ খুব বেশি হলে মাত্র গোটা দশেক ধরতে পারবে, সংখ্যায় প্রায় ছ'শোর কাছাকাছি হবে।'

শুধু চুনি নয়, অন্যান্য পাথরও ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আফ্রিকার উপকূল শাসন করেছে ফিনিশিয়ান, পারশিয়ান, গ্রীকরা; এমন একটা সময়ে মানুষ যখন তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের সঙ্গে বহন করত। কিছু কিছু অমূল্য রত্ন, বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, কাটা ও পালিশ করা হয়েছে দুনিয়ার পুব দিকে। প্রথমে এগুলো গ্রীকদের হাতে পড়ে, তারপর রোমান বিজয়ীদের হাতে। সবগুলো জড় হয় এক জেনারেলের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়, তারপর হয় চুরি যায় নয়ত হারিয়ে যায় এক যুদ্ধে—ডোমিটিয়ান মাস তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। এগুলোও এ সময় তার তৈরি শহরে এসে পৌঁছায়।

আজ সে-সব পাথরের মূল্য আন্দাজ করা সত্যি কঠিন। কয়েকশো মিলিয়ন

স্টার্লিং পাউন্ড হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তবে দুঃখের বিষয় হলো মাস তার ডায়েরীতে গুপ্তধনের সঠিক অবস্থান উল্লেখ করে যায়নি।

'ব্যাপারটা যে ইন্টারেস্টিং, এ-ব্যাপারে আশা করি তুমি আমার সাথে একমত হবে,' আশরাফের পড়া শেষ হতে মুখ খুলল পাইথন। 'খর্বকায় ও অল্পবুদ্ধি ড. জিমসন গুপ্তধন সম্পর্কে লেখা পাতাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। ব্যাটা ছিল ইহুদি! হোয়াইটস্টোনও তাই। ওরা গোপনে পরামর্শ করেছিল, গুপ্তধন উদ্ধার করে ইসরায়েলি সরকারের হাতে তুলে দেবে, গুপ্তধন বেচা টাকা দিয়ে তারা যাতে ইসরায়েলের অর্থনীতিকে চাঙা করতে পারে। তাদের ভাষায়, এটা একটা জনহিতকর কাজ।' চওড়া হাসি ফুটল পাইথনের কুৎসিত মুখে। 'এ-কথা তো আলজিরিয়ান সরকারকে বলা সম্ভব নয়। তবে স্যার ভিক্টর ক্যানিংকে না বলে উপায় ছিল না, কারণ মাটি খুঁড়ে শহরটাকে বের করতে একজন ধনী লোকের সাহায্য তো দরকার। এত লোক থাকতে ভিক্টর ক্যানিংকে বেছে নিল ওরা। ক্যানিংকে, ওহ্ মাই গড!' শব্দহীন অদম্য হাসিতে কাঁপতে লাগল প্রকাণ্ড দৈত্য। ঘটনাটা তাকে বিপুল আনন্দ দিয়েছে।

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল আশরাফ, দেখল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে পাইথন।

'ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত,' নরম সুরে বলল পাইথন। 'এইমাত্র তুমি যখন আনমনা হয়ে ছিলে, তোমাকে রীতিমত ইন্টেলিজেন্ট দেখাচ্ছিল।'

নিজেকে অভিশাপ দিল আশরাফ। অকস্মাৎ মুখভাব বদলানো উচিত হবে না, বুঝতে পারল সে। ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড সিধে করল, পাইথনের দিকে তাকাল চেহারায় সামান্য রাগ মেশানো বিহ্বল ভাব ফুটিয়ে। 'আমাকে বোকা বলে মনে করা হয়, এ আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আমি তা নই।'

ফিক ফিক করে হাসল পাইথন। 'তা বোধহয় নও,' বলল সে, হাবভাব দেখে মনে হলো চিন্তিত। 'তা বোধহয় সত্যি নও।'

প্রকাণ্ড আঙুলগুলো টেবিলের ওপর কিছুক্ষণ ড্রাম বাজাল, তারপর ইঙ্গিতে খালি প্লেটটা দেখাল সে। 'টেবিলটা পরিষ্কার করো, তারপর চলো দেখে আসি লেবাররা কি রকম কাজ করছে।'

পাঁচ

আশরাফের চেহারায় সমীহ, নরম সুরে জানতে চাইল, 'মাসে পানির সরবরাহ সম্পর্কে আপনার স্বামী কিছু জানতে পেরেছেন, মিসেস হোয়াইটস্টোন?' আজ সন্ধ্যায় গ্যাস চেম্বারে আবার ওদের যত্ন নেয়া হবে, ব্যাপারটা ভুলে থাকার জন্যে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে সে।

স্বামীর বিছানায় বসে আছেন ভদ্রমহিলা। রাতে ঘুমানো ছাড়া বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটান তিনি। স্ত্রীর কথার প্রায় কোন জবাবই দেন না প্রফেসর, তাঁকে কথা বলাবার চেষ্টা করা হলে খেপে যান। আশরাফের ধারণা, ভদ্রলোকের মন ও মাথার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।

টীমের তরুণ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে এক-আধবার কথা বলে বটে, তা-ও অত্যন্ত অলস ও নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। সাধারণত ইতিমধ্যে মাটি খোঁড়ার যে-সব কাজ করা হয়েছে সে-সব বিষয়ে আলোচনা করে তারা, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নয়। বর্তমান তাদের কাছে আতঙ্ককর দুঃস্বপ্ন, সেদিক থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছে। নবাগত চারজন আগন্তুকের সঙ্গে খুবই কম কথা বলে তারা, তবে ভয় ও সন্দেহভরা দৃষ্টিতে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

এখানে বেশিদিন থাকতে হলে সে-ও ওদের মত প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হবে, কল্পনা করে শিউরে উঠল আশরাফ। এখন দুপুর, কাজের বিরতি। ভোর থেকে একটানা বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ করেছে বন্দীরা, তারপর কমনরূমে এনে খাবার দেয়া হয়েছে তাদের। রোদের প্রখরতা কমলে আবার চারটের সময় কাজ শুরু করবে ওরা, সাতটা পর্যন্ত আর কোন বিরতি নেই।

মিসেস হোয়াইটস্টোনের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আশরাফের দিকে। ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ভেতর দিকে ডেবে গেছে। চেহারায় বিহ্বল একটা ভাব। 'পানি?' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ওকে আপনার বিরক্ত করা উচিত হবে না। ও কি আর নিজের মধ্যে আছে, মি.…দুঃখিত, আপনার নামটা আমি স্মরণ করতে পারছি না। ওকে নিয়ে ভারি চিন্তায় আছি।' স্বামীর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিলেন, দিনের পর দিন কোদাল আর শাবল চালিয়ে হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

'না, ওঁকে আমি বিরক্ত করব না,' বলল আশরাফ। 'কিন্তু আপনার কি মনে নেই? ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে কি আলোচনা হয়েছিল?'

মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়ালেন মিসেস হোয়াইটস্টোন। 'ও বলছিল…কি বলছিল?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'হ্যাঁ, ফোগারা সিস্টেম।' ফোগারা সিস্টেম কি, আশরাফ জানে না। ধারণা করল, রানা বা সোহানা হয়তো বলতে পারবে। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ আমরা জানতাম আরও অনেক পরে এই সিস্টেম চালু হয়।' কথা বলছেন বটে, তবে ভদ্রমহিলার চেহারায় কোন আগ্রহ নেই। 'উৎসটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলাম আমরা। কাছাকাছি একটা নদী বা কুয়া থাকতে হবে। নিশ্চয়ই সেটা এক হাজার বছর বা আরও বেশিদিন আগে শুকিয়ে গেছে। তবে চিহ্ন থাকবে। তারপরই তো ওই লোকগুলো হাজির হলো…' হঠাৎ চোখ বুজে শিউরে উঠলেন তিনি, কয়েকটা ভাঁজ পড়ল মুখে। আশরাফ বুঝতে পারল, কান্না থামাবার চেষ্টা করছেন।

মৃদু, নরম গলায় বলল সে, 'হাল ছাড়বেন না, মিসেস হোয়াইটস্টোন। আমি আপনাকে বলছি, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ছোট কামরাটার দিকে যাচ্ছে আশরাফ, ওখানে জেনি আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে, না? ভাবছে সে। কিভাবে সব ঠিক হবে, শুনি? রানা ও সোহানাকে যতটুকু চেনে সে, ওরা জাদু জানে না। আর তাক লাগানো কয়েকটা জাদু দেখাতে না পারলে এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনা নেই ওদের। জাদু তো জানেই না, তার ওপর সমস্যাটাকে ওরা যে দৃষ্টিতে দেখছে তাতে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা আরও কমে তো বাড়ে না। রানা ও সোহানা, দু'জনেই শুধু নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর কথা ভাবছে না, ভাবছে কিভাবে সবগুলো বন্দীকে নিয়ে পালানো যায়। মুশকিল হলো, একটা নো-ম্যানস ল্যান্ডে রয়েছে ওরা। বাইরে থেকে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। তার ওপর, ওরা নিরস্ত্র।

আজ বিকেলে আবার পাইথনের সঙ্গে বসতে হবে তাকে, মনে পড়তেই ঘেমে গেল আশরাফ। এরচেয়ে অনেক ভাল ছিল মাটি খোঁড়ার কাজ পেলে। পাইথনের হাসির খোরাক হওয়া মানে প্রতি মিনিটে এক বছর করে আয়ু কমে যাওয়া। হতাশ ভাবটা মন থেকে মুছে ফেলে নতুন পাওয়া আইডিয়াটা নিয়ে ভাবল সে। সন্দেহ নেই, আইডিয়াটা কোন কাজের নয়, তবে অন্তত ডাইভারশন হিসেবে কাজ দিতে পারে। খিলানের নিচ দিয়ে ছোট কামরাটায় ঢুকল সে।

ঢুকেই বিব্রত বোধ করল আশরাফ। কাপড়চোপড় খুলে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে জেনি, হাতে বালি নিয়ে গায়ে ঘষছে। এটা হলো তাদের গোসলের বিকল্প, পদ্ধতিটা সোহানার কাছ থেকে শিখেছে। শরীর পরিষ্কার রাখার জন্যে খুব কাজ দেয়। ওদের সমস্ত জিনিস-পত্র কেড়ে নিয়েছে শত্রুরা, এমনকি একটা তোয়ালে বা টুথব্রাশ পর্যন্ত দেয়নি। ওদের দিন কাটছে আদিম মানুষদের মত। একটা কানাগলির শেষ মাথায় ল্যাট্রিনটা, কমনরুম থেকে যাওয়া যায়। প্রকৃতিরই তৈরি একটা গভীর ফাটল মাত্র, কিনারার কাছে স্তূপ করা আছে বালি, গজ দেড়েক চটও টাঙানো আছে সামনের দিকটায়।

নোংরা থাকতে হচ্ছে বলে আর্কিওলজিকাল টীমের কারও কোন অভিযোগ নেই, ব্যাপারটা তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। তবে রানা ও সোহানার দলটা নিয়মিত স্যান্ড-বাথ নেয়। সোহানা বলেছে, পরিচ্ছন্ন থাকলে মনোবল অটুট থাকে।

খিলানের নিচে থমকে দাঁড়াল আশরাফ, বলল, 'দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, আশরাফ,' তাড়াতাড়ি কাপড় তুলে গা ঢাকল জেনি। 'আমার হয়ে গেছে। এক মিনিট শুধু পিছন ফিরে থাক, কাপড়টা পরে নিই।' চোখ সরাবার আগে আশরাফ দেখল, জেনির একহারা শরীরটা নিরেট ও অত্যন্ত সুগঠিত। ঘুরল না সে, অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে বিছানার দিকে এগোল।

বিছানার ওপর এক জোড়া লোকেটর পড়ে রয়েছে। 'আজ সকালে খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, কাজ করার সময়?' জানতে চাইল সে।

'খুব বেশি না।' দ্রুত হাতে ব্রেসিয়ার পরল জেনি, কোমরে স্ন্যাকস্ তুলে আশরাফের দিকে তাকাল, শার্টটা হাতে। চেহারায় উদ্বেগ, বলল, 'তোমাদের কথা ভেবে খুব চিন্তায় আছি আমি, আশরাফ। আজ সন্ধেবেলা গ্যাস চেম্বারে ঢোকানো হবে তোমাদের।'

মনে করিয়ে না দিলেই ভাল হত, ভাবল আশরাফ। 'চিন্তা কোরো না,' জেনিকে অভয় দিল সে। 'আমার ব্যাপারটা রানা সামলাবে। আর নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, দু'জনেই জানে ওরা।'

'তা বটে।' ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল জেনির ঠোঁটে। শার্টটা গায়ে দিয়ে বিছানায় আশরাফের পাশে এসে বসল সে। 'সবাই আমরা ওদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছি, কোন কাজে লাগছি না। জানি না কিভাবে ওরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে আমাদের।'

'তুমি বড় অধৈর্য,' বলল আশরাফ, বলার সুরে আত্মবিশ্বাসের ভাব আনার চেষ্টা করল। 'ওদেরকে তুমি চেন না, ঠিকই একটা ব্যবস্থা করবে। হয়ত অযথা সময় নষ্ট, তবু আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করবে তুমি, জেনি? আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই।'

বড় কামরাটায় নিজের বিছানায় বসে রয়েছে রানা। ওর হাঁটুর ওপর চ্যাপ্টা ও সমতল একটা পাথর। কঠিন একটা অ্যারোহেড ঘষে তীক্ষ্ণ করার জন্যে ওটাকে কামারের নেহাই হিসেবে ব্যবহার করছে।

একটা তীর ইতিমধ্যে বানানো হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ থেকে মাটি ও পাথর তোলার জন্যে বেতের বড় আকারের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়, সেই ঝুড়ির একটা সরু বাঁশ চুরি করে এনে তৈরি করা হয়েছে ওটা। প্রথম অ্যারোহেডটাও ঘষে ধারাল করা হয়েছে। ওটা পাতা আকৃতির, মাঝখানে একটা আঙুলের মত মোটা বোঁটা আছে। বোঁটাটা বাঁশের গর্তে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর শক্ত করে বাঁধা হয়েছে সরু তার দিয়ে। তারটাও চুরি করা।

ধনুকটা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। ধনুকের জন্যে কাঠ ব্যবহার করছে রানা। প্যাপিরাস আবিষ্কৃত হবার পর মাসে প্রথম এসেছিল আরব বেদুইনরা, বালি সরিয়ে তারাই উপত্যকায় ঢোকার প্রবেশ পথটা মুক্ত করে। সম্ভবত তাদেরই তাঁবুর একটা অংশ ছিল কাঠটা, ধনুক তৈরির জন্যে আদর্শ। ব্যবহার করার আগে আরও কিছু কাজ আছে ওটার ওপর—খানিকটা চাঁচতে হবে, আকৃতি ঠিক করার জন্যে বাঁকা করতে হবে আরেকটু। জ্যা বা ছিলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এক ইঞ্চি চওড়া নাইলন, পাওয়া গেছে জেনির মোজা থেকে। পাক খাইয়ে শক্ত করা হয়েছে ওটাকে।

আশরাফের বিছানায় বসে রয়েছে সোহানা, রানার দিকে মুখ করে। ওর হাতে রানার তৈরি একটা ছুরি। হাতলটা কাঠের, তার দিয়ে আঁটো করে বাঁধা। ফলাটা লোহার। কয়েক শো বছর মাটির নিচে পড়ে থাকায় ভোঁতা হয়ে গেছে ফলার কিনারা। একটা পাথরের ওপর ধীরে ধীরে ঘষছে ও।

চোখে অস্বস্তি, সোহানার দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, অন্তত সাধারণ দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়বে না, কিন্তু ওর মন-মেজাজে সূক্ষ্মতম তারতম্য ঘটলেও তা রানার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ওর চেহারায় অদ্ভুত একটা শান্ত ভাব দেখা দিয়েছে, লক্ষ করে

মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। ও প্রায় নিশ্চিত, কিছু একটা করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে সোহানা। ব্যাপারটা ওকে জানায়নি, সেটাই রানার উদ্বেগের কারণ। এর একটাই অর্থ হতে পারে; প্ল্যানটা এমনই যে শুনলে বাধা দিতে পারে রানা। হয়তো অসম্ভব কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে সোহানা।

জীবনে এই প্রথম নিজের ভেতর আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করছে রানা। ও নিরস্ত্র, সেজন্যে নয়। পেনিফিদার ও ব্রুনেল পুরানো শত্রু, এই সুযোগে প্রতিশোধ নেবে, কারণ সেটাও নয়। আসল কারণ পাইথন মার্কাস। ওই দানবের সঙ্গে লড়ে জিততে পারবে না ও, এটা প্রমাণিত সত্য। দু'জনের শারীরিক শক্তির মধ্যে কোন তুলনা চলে না, রানার মত চার-পাঁচজন লোককে একা সামলাতে পারবে পাইথন অনায়াসে। তবু স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা হারায়নি রানা, মরার আগেই মরে যেতে রাজি নয় বা লড়ার আগেই কাবু হবে না। লড়তে যে হবে ওকে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। লড়ার জন্যে মানসিকভাবে তৈরিও সে। জানে পারবে না, হেরে যাবে। আর পাইথনের সঙ্গে হেরে যাওয়া মানে মৃত্যু।

ও মারা গেলে কি ঘটবে? সমস্ত দায়িত্ব চাপবে একা সোহানার কাঁধে। সোহানার ট্রেনিং, নীতিবোধ, বিবেক সম্পর্কে জানে ও। রানা নেই দেখলেও ভয় পাবে না সে। শুধু একার প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করবে না। কাজেই জিততে না পারুক, লড়ার সময় ওকে লক্ষ রাখতে হবে পাইথন যেন যত বেশি সম্ভব মারাত্মকভাবে আহত হয়। সোহানার কাজ তাতে খানিকটা হলেও সহজ হয়ে যাবে। আশরাফ আর জেনিকে বাঁচাতে হবে···

জেনিকে দেখতে পেল রানা, হাতে লোকেটর নিয়ে কমনরুমের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে। তার সঙ্গে আশরাফও রয়েছে। কি যেন একটা পরীক্ষা করছে ওরা, বেশ কিছুক্ষণ ধরে। রানা আন্দাজ করল, জেনিকে বিপদের কথা ভুলিয়ে রাখার জন্যে নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধি বের করেছে আশরাফ।

জেনির জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। কি ভাল একটা মেয়ে। সরল, সাহসী, সুন্দর ও অন্ধ। অথচ কি সাংঘাতিক একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছে বেচারি। কাজ শেষ হয়ে গেলে ওকেও মেরে ফেলা হবে।

'ফোগারা কি, রানা?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল আশরাফ, রানার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আন্ডার গ্রাউন্ড চ্যানেল, মরুভূমিতে পানি আনার জন্যে মাটি কেটে তৈরি করা হয়,' মুখ তুলে বলল রানা, কিছু না ভেবেই। 'কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। এ-ব্যাপারে আর কি জানো তুমি?'

'খানিক পর পর চিমনি রাখতে হয়, শ্রমিকরা যাতে দম নিতে পারে, পানি যাতে বাতাস পায়। খোলা চ্যানেলে পানি যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, পাতালে তা ঘটে না। সাহারায় এখনও প্রায় দু'হাজার মাইল ফোগারা আছে। এখানে-সেখানে প্রায় দেখা যায় ফাঁপা বালির দুর্গের মত মাথা তুলে আছে সারি সারি চিমনি।'

'হঠাৎ কেন তুমি জানতে চাইছ, আশরাফ?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'না, মিসেস হোয়াইটস্টোন শব্দটা উচ্চারণ করলেন কিনা। আমি তাঁকে পানি

সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। শোন তাহলে, আমরা বোধহয় কিছু একটা পেয়েছি। বলা উচিত, জেনি পেয়েছে।'

দুটো বিছানার মাঝখানে চলে এল জেনি, বসল রানারটায়। 'এই কমনরুমেরই তলা দিয়ে একটা অ্যাকুইডাকট্ চলে গেছে। ওটায় পানি নেই প্রায়···কয়েক শো বছর, আমার ধারণা। তবে এককালে ছিল।'

রানা ও সোহানা পরস্পরের দিকে তাকাল।

আশরাফ বলল, 'চিন্তাটা আমার মাথায় এভাবে এল। আমাদের বন্ধু মাস এবং তার প্রজারা যখন এখানে বসবাস করছিল, তখন নিশ্চয়ই সব জিনিসের অঢেল সাপ্লাইও ছিল। তারপর আমার মনে হলো, দু'জন রোমান এক হলে সব সময় প্রথমে যে কাজগুলো করত, তার মধ্যে একটা হলো অ্যাকুইডাকট্ তৈরি।'

ভোঁতা ছুরি আর পাথরটা চাদরের ভাঁজে লুকিয়ে রাখল সোহানা। 'এখানে?' জানতে চাইল সে, পায়ের আঙুল দিয়ে কমনরুমের মেঝেতে টোকা দিল, তাকাল আশরাফের দিকে। 'এটা নিরেট নয়, বলতে চাইছ?'

'বেশিরভাগই নিরেট।' লম্বা চেম্বারের একটা পাশ হাত তুলে দেখাল আশরাফ। জেনি অ্যাকুয়েডাকট্টা পাবার পর ভাল করে দেখার জন্যে খানিকটা বালি সরালাম আমরা। পাথরের দু'সারি ফলক দেখেছি, মাটিতে গাঁথা, ওদিকে—দেয়ালের গা ঘেঁষে, একটা সমান্তরাল রেখা ধরে এগিয়েছে···'

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল সোহানা, জেনিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবেগে একটা চুমো খেয়ে ফেলল। দম ফেলার ফুরসত পেয়ে জেনি বলল, 'আইডিয়াটা ছিল আশরাফের,' মুখে আড়ষ্ট সলজ্জ হাসি।

'দুর্ভাগ্য আমি তোমার মত মেয়ে হয়ে জন্মাইনি,' আশরাফের গলায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

মুচকি হেসে চাদরের ভাঁজ খুলল রানা, ভেতরে ছোটখাট অনেকগুলো জিনিস দেখা গেল। লোহা ও হাড়ের কয়েকটা অ্যারোহেড, লোহার জং ধরা পাত, প্যাঁচানো তার, কাঁচের টুকরো, চামড়ার তৈরি স্লিং, কয়েকটা গোল ও মসৃণ পাথর, খাট থেকে খুলে নেয়া লোহার কয়েকটা লম্বা ও চ্যাপ্টা টুকরো। এরকম একটা লোহার টুকরো হাতে নিল রানা, একদিকের মাথা সামান্য বাঁকা, সিঁদকাঠির মত। বলল, 'চল, দেখে আসি।'

বালি সরানো হয়েছে, তবু পাথরের ফলকগুলো সহজে চোখে পড়ল না, জয়েন্টগুলো বালি আর ধুলায় ভরাট হয়ে গেছে। দু'সারি ফলক, সমান্তরালভাবে এগিয়েছে, আকৃতিটা ইংরেজি এল হরফের মত। এল-এর লম্বা বাহুটা শেষ হয়েছে পিছনের দেয়ালের গায়ে, নিচের ছোট বাহুটা লম্বা দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকেছে, দরজার কাছাকাছি।

কোন আলোচনা ছাড়াই পিছনের দেয়ালের গায়ে সেঁটে থাকা ফলকগুলোর ওপর মনোযোগ দিল রানা ও সোহানা। ভোঁতা টুলস দিয়ে আধ ঘণ্টার মত লাগল জয়েন্টগুলো পরিষ্কার করতে। আরও এক ঘণ্টা বেরিয়ে গেল প্রথম ফলকটা মাটি খুঁড়ে ওপরে তুলতে। অবশ্য দ্বিতীয় ফলকটা প্রায় অনায়াসে তোলা গেল।

নিচে চৌকো আকৃতির একটা চ্যানেল, পাথর কেটে তৈরি, ওপরের কিনারায় খানিকটা করে কার্নিস আছে, ফলে ঢাকনি হিসেবে ফেলা ফলকগুলো একটার সঙ্গে অপরটা সেঁটে আছে। চ্যানেলটা চওড়ায় আঠারো ইঞ্চির মত হবে, গভীরতাও ওইরকম। শুকনো খটখটে। ঝুঁকল রানা, চৌকো গর্তের ভেতর মাথা ঢোকাল। এক মুহূর্ত পর সিধে হলো ও, শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল। 'আরও দুটো ফলক সরাও, চেষ্টা করে দেখি চ্যানেলের ভেতর ঢুকতে পারি কিনা।'

'তোমার পিঠ চ্যানেলের সিলিঙে ঠেকে যাবে,' বলল সোহানা। 'সেক্ষেত্রে আমি যাব।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

অন্ধকার গর্তটার দিকে তাকিয়ে আছে আশরাফ। দেয়ালের নিচে দিয়ে চ্যানেলটা কোন দিকে গেছে কে জানে! বাইরের দিকে কোথাও ভাঙা থাকতে পারে চ্যানেলের মাথা, ভেতরে সাপ বা ইঁদুর থাকতে পারে। তার মত, রানা ও সোহানাও এ-সব জানে। কিন্তু আলোচনা করছে না, ভয়ও পাচ্ছে না। ওটার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো সম্ভব নয়। রানাকে ক্রল করে এগোতে হবে, যাকে বলে বুকে হেঁটে, হাত দুটো থাকবে সামনে লম্বা করা। ভেতরে একবার ঢোকার পর দিক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না, ঘুরতে পারবে না রানা। ফেরার সময় পিছু হটতে হবে ওকে, গর্তটার মুখে ওরা ওর পা দুটো দেখতে পাবে আগে।

সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল রানা, আন্ডারওয়্যার আর বুট বাদে। রুমালটা কপালে বেঁধে নিল।

আশরাফ বলল, 'কাপড় না খুললেই কি ভাল হত না, আঁচড়-টাঁচড় কম লাগত।'

'আশেপাশে লন্ড্রী নেই,' বলল রানা। 'ওরা যদি জিজ্ঞেস করে কাপড় নোংরা হলো কিভাবে, কি জবাব দেব?' আরও দুটো ফলক তোলা হতেই গর্তের ভেতর নেমে পড়ল ও, দেয়ালের দিকে পিছন ফিরে, পা দুটো সামনের দিকে পিছলে যেতে দিয়ে শুয়ে পড়ল ধীরে ধীরে, তারপর শরীরটা মুচড়ে উপুড় হলো। আশরাফ আশা করল, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোবে রানা, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল টানেলের ভেতর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ও। সে উপলব্ধি করল, রানা ওর ভর চাপিয়েছে বাহু ও পায়ের আঙুলের ওপর, চ্যানেলের মেঝে থেকে শরীরটা এক দেড় ইঞ্চি উঁচু হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড চাপ পড়ছে পেশীর ওপর। কে জানে এভাবে কতদূর যেতে পারবে ও। এমন হতে পারে, সামনেই কোথাও মাটি ধসে পড়ায় বন্ধ হয়ে গেছে চ্যানেলটা।

শান্তভাবে অপেক্ষা করছে ওরা। সোহানার চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই, অন্ধকার গর্তটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শুধু। আশরাফের হাতে একটা সিগারেট, ধরাবার কথা বোধহয় ভুলে গেছে। সোহানাকে অস্বাভাবিক শান্ত মনে হলো তার, গত তিন দিনে এরকম শান্ত ভাব তার চেহারায় দেখা যায়নি।

কমনরুমের আরেক প্রান্ত থেকে এক লোক ধীর পায়ে হেঁটে আসছে ওদের দিকে। নামটা মনে করতে পারল না আশরাফ, আর্কিওলজিকাল টীমের এই

একটিমাত্র লোকই ওদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলেছে। কাছে এসে গর্তটার দিকে তাকাল সে, ভোঁতা দৃষ্টিতে বিড়বিড় করে জানতে চাইল, 'কি এটা?'

আশরাফ জবাব দেয়ার আগে সোহানা চাপা স্বরে প্রায় গর্জে উঠল, 'কোথায় কি দেখছ তুমি? কিছুই নেই এখানে। আবার তুমি চোখে ভুল দেখছ। যাও, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকো, তা না হলে ওদেরকে বলে তোমাকে গ্যাস চেম্বারে পাঠাব।'

রক্তশূন্য হয়ে গেল লোকটার চেহারা, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে মাথা নাড়ল সে, তারপর ঘুরে চলে গেল।

জেনি বলল, 'মাই গড! সোহানা, কাজটা কি তোমার উচিত হলো? বেচারাকে এরকম ভয় না দেখালেও পারতে।'

'ওর ভালর জন্যেই ভয় দেখালাম,' বলল সোহানা। 'আমাদের সবার ভালর জন্যে।'

'মানে?'

'আর্কিওলজিকাল টীমের কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না,' বলল সোহানা। 'কাজেই আপাতত জড় পদার্থ হয়েই থাকুক ওরা। যখন পালাবার সময় হবে, যা করতে বলব তাই করবে ওরা, কোন তর্ক করবে না। সবাইকে নিয়ে পালাবার কথা ভাবছি আমরা, শুধু নিজেদের গা বাঁচাতে চাইছি না।'

'সবাইকে নিয়ে?' কর্কশস্বরে বলল আশরাফ। 'ইট'স হোপলেস, সোহানা।' গর্তটার দিকে তাকাল সে। 'টানেলটা থেকে কোথায় উঠতে পারবে রানা, আমার কোন ধারণা নেই। উপত্যকার মুখে গার্ড আছে। তবু ধরা যাক টানেল থেকে এমন এক জায়গায় মাটির ওপর উঠল রানা যেখান থেকে গার্ডদের দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে জেনিকে নিয়ে তোমরা, মানে তুমি চলে যেয়ো।'

'আর তুমি?'

'এখানে থেকে পাইথনের হাতে খুন হতে রাজি আছি, কিন্তু ওই গর্তে ঢুকতে পারব না,' বলল আশরাফ। 'স্রেফ দম আটকে বা ভয়েই মারা যাব।'

'তোমাকে ছাড়া কোথাও আমি যাব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেনি।

'কাজেই,' হাসি চেপে বলল সোহানা, 'অন্তত জেনিকে বাঁচাবার জন্যে হলেও ওই গর্তে ঢুকতে হবে তোমাকে, আশরাফ।'

'কিন্তু বাকি সবার কি হবে? ভেবেছ প্রফেসর হোয়াইটস্টোনকে এর ভেতর ঢোকাতে পারবে তুমি?'

'যখনকার সমস্যা তখন ভাবা যাবে, এখন চুপ করো তো।'

আধ ঘণ্টা পর অস্পষ্ট খসখসে একটা আওয়াজ শোনা গেল, সরু গর্তের ভেতর পা দেখতে পেল ওরা। পিছিয়ে এল শরীরটা, ঘুরল রানা, বসল। ঝুঁকে ওর হাত ধরল সোহানা, টেনে তুলল। ঘাম আর ধুলোয় সারা শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে, তবে দুটো মাত্র সামান্য আঁচড়ের দাগ দেখা গেল। উত্তেজনায় চকচক করছে রানার চোখ।

কথা বলার আগে ঠোঁট থেকে ধুলো মুছল রানা। 'মন্দ নয়, সোহানা।

ফলকগুলো জায়গা মত বসিয়ে রাখ। বলছি, আগে আমি পরিষ্কার হয়ে নিই।'

ছোট কামরায় ঢুকে দিগম্বর সাজল রানা, বালি ঘষল সারা শরীরে। এক মিনিট পর ভেতরে ঢুকল সোহানা, পরিষ্কার হতে সাহায্য করল ওকে, পিঠে বালি ঘষে দিল। পানি দিয়ে মুখ ও নাকের ভেতরটা ধুল রানা, তারপর পুরো এক পাইন্ট খেয়ে ফেলল ঢকঢক করে। খানিক পর ভেতরে ঢুকল আশরাফ ও জেনি, সোহানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। পাথরের ফলকগুলো আগেই জায়গামত বসানো হয়েছে, আশরাফ ও জেনি সেগুলোর ওপর বালি ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

মধ্যাহ্নবিরতি শেষ হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। ইতিমধ্যে কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে রানা, বসে আছে মিসেস হোয়াইটস্টোনের বিছানায়। হাড় দিয়ে তৈরি একটা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে ও। 'একটানা, কোথাও না থেমে, প্রায় দশ মিনিট ক্রল করি আমি,' বলল ও, চেহারা ও গলা দুটোই শান্ত এখন। 'দু'এক জায়গায় টানেলটা সামান্য বাঁক নিয়েছে, কোথাও পাথর সরে যাওয়ায় মাটি ঢুকে পড়েছে, সরু হয়ে গেছে প্যাসেজ। তবে এগোতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি আমার। কিন্তু শেষ মাথাটা কোথায়, দেখতে পাইনি। টানেলটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তাহলে যে বললে মন্দ নয়?' আশরাফের গলায় রাগ।

'প্রথমে দেখলাম, মাটি পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। মাটি সরাতে গিয়ে দেখি, এরপর পাথর। তবে আলগা পাথর। দেরি হলে তোমরা চিন্তা করবে ভেবে ফিরে এসেছি। আমার ধারণা, পাথরগুলো সরালে টানেলের মুখটা পেয়ে যাব আমরা। ওটা বন্ধ হয়ে আছে মুখের কাছেই, সম্ভবত। দশ মিনিট ক্রল করেছি, তারমানে মুখটা উপত্যকার বাইরেই কোথাও হবে।'

'তারমানে চাইলেই কেউ আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারছি না!' আশরাফের গলায় হতাশা।

'আজ রাতেই আরেকবার যাব আমি,' বলল রানা। 'যতটা পারি পাথর সরাব। হয়তো এভাবে কয়েকবার যেতে হবে, তবে শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরুবার একটা পথ ঠিকই পাওয়া যাবে।'

পালাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র, তবে এখুনি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, বুঝতে পেরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল আশরাফ। তারপর সে ভাবল, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানেই যে বেঁচে যাওয়া, তা-ও তো নয়। ওদের মধ্যে এক বা একাধিক লোককে না দেখলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে শত্রুরা। অ্যাকুয়েডাক্টটা দেখে বুঝতে বাকি থাকবে না কি ঘটেছে। চারপাশে এক শো মাইল শুধুই মরুভূমি, পায়ে হেঁটে কত দূরই বা যাওয়া সম্ভব, খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা মুক্ত থাকতে পারবে ওরা।

সোহানা ও রানা আলাপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই আশরাফের। হঠাৎই শুনতে পেল, রানা বলছে, '...ইতিমধ্যে আমি তীর-ধনুক তৈরি করে ফেলি। আশা করছি কাল রাতের মধ্যে একটা উপায় পেয়ে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'আমারও তাই ধারণা।' অস্বাভাবিক শান্ত ও ঠাণ্ডা

লাগল ওকে।

'এখনও আধ ঘণ্টাটাক সময় আছে, ধনুকটার কাজ শেষ করতে পারব বলে মনে হয়,' বলল রানা। 'ভাল কথা, আমাদের কাছে ছোটখাট যে-সব অস্ত্র আছে সব গর্তের ভেতর লুকিয়ে রাখতে হবে, ফলকগুলোর নিচে। এখনও সার্চ করেনি, তবে করতে কতক্ষণ।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'যাই, আমিই রেখে আসি।' বিছানা ছেড়ে বড় কামরাটার দিকে এগোল রানা।

ছোট কামরা থেকে রানা বেরিয়ে যাচ্ছে, ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সোহানা। রানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আশরাফ, এখন তুমি আমার কথা শুনছ?'

'সরি। তুমি ধরে ফেলেছ? একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম।'

'রানা কি বলল, শুনেছ?' জানতে চাইল সোহানা। 'কাল রাতের মধ্যে একটা উপায় পেয়ে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তোমারও তাই ধারণা। যদিও আমি বুঝতে পারছি না...'

আশরাফকে থামিয়ে দিল সোহানা। 'তোমার বুঝে কাজ নেই। তোমাকে যা করতে বলা হবে তুমি তাই করবে।'

'ইয়েস, ম্যা'ম।'

সোহানা হাসল না। ওর চোখে এমন একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল, যেন দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। 'পাইথনের প্ল্যানটা বুঝতে পারছ?' উত্তরের জন্যে থামল না ও। 'আমার ধারণা, খুব বড় ধরনের একটা মজা পাবার আয়োজন করছে সে। এটা তার গোপন প্ল্যান, মনে লালন করছে, আর পুলক অনুভব করছে। বেশ লম্বা একটা সময় অপেক্ষা করে আছে, ধৈর্য প্রায় শেষ। এবার ঘটনাটা ঘটাবে সে।'

'ঠিক বলেছ।' আশরাফের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। 'ঘটনাটা কি হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'সেটা পরিষ্কার,' বলল সোহানা, হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো।

'আমিও জানি কি সেটা,' বলেই ফুঁপিয়ে উঠল জেনি।

তাড়াতাড়ি জেনির একটা হাত ধরে ফেলল সোহানা। 'চিন্তা কোরো না, জেনি। কারণ, ঘটনাটা আমি ঘটতে দিচ্ছি না।'

'কি ঘটবে?' কষ্ট করে একটা ঢোক গিলল আশরাফ, ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'পাইথনের প্ল্যানটা রানাকে নিয়ে,' বলল সোহানা, মৃদু চাপ দিল জেনির হাতে। 'ঘটনাটা যাতে না ঘটে, তার একটা উপায় বের করেছি আমি। তোমাদের সেটা এখুনি জানার দরকার নেই।' আবার আশরাফের দিকে তাকাল ও। 'আমাদের মধ্যে এক মাত্র তুমিই পাইথনের কাছাকাছি থাকতে পারছ। তুমিই তার মেজাজ সবচেয়ে ভাল বোঝ, আশরাফ। আমি চাই, সে কোন ঝামেলা পাকাতে চাইছে, এটা বুঝতে পারার সাথে সাথে আমাকে তুমি জানাবে।'

'ঠি-ঠিক আছে।' আবার ঢোক গিলল আশরাফ। 'কিন্তু জানাব কিভাবে··· মানে, তোমার সাথে যদি কথা বলার সুযোগ না পাই?'

'যে-কোন একটা সিন-ক্রিয়েট করবে। ভান করবে পাথরে হোঁচট খেয়েছ। এক পায়ে লাফাবে। পরিস্থিতি বুঝে একটা কিছু করলেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'সময় কিন্তু হয়ে এসেছে। আজ পাইথন মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করছিল আমার সাথে। বলছিল মানুষকে মরতে দেখলে তার ভাল লাগে। আমার মনে হয়, ঘটনাটা যে এবার ঘটবে, এটা তার একটা লক্ষণ।'

কথা না বলে চিন্তা করছে সোহানা।

'তোমার প্ল্যানটা কি, বলবে না আমাদের?' এক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল আশরাফ, লক্ষ করল নিঃশব্দে চোখ মুছছে জেনি।

সোহানার কথা শুনে মনে হলো, আশরাফের প্রশ্নটা শুনতে পায়নি ও। 'রানা জানতে চাইছিল, বিল ওয়াটসন প্লেন নিয়ে কাল আসবে কিনা। কালই তো আসবে, তাই না?'

'আসার তো কথা। লক্ষ করছি, অতিরিক্ত খাবার আর পানি নিয়ে একদিন পর পর আসছে সে। কাল রাতে এসেছিল।'

'আমাকে খুলে বলেনি, তবে মনে হয় রানারও একটা প্ল্যান আছে,' অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা। খানিক পর যেন গা ঝাড়া দিয়ে চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে এল ও, মৃদু হেসে জেনির কাঁধে একটা হাত রাখল। 'এত মন খারাপ করে থেকো না তো তোমরা দু'জন।'

'আমার মন সত্যি খারাপ,' অনুযোগের সুরে বলল আশরাফ। 'কারণ প্ল্যানটা তুমি বলছ না।'

'যাই ঘটুক, বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করবে। আমার কাজে কোন রকম বাধা দেবে না। শুধু মনে রেখ, অন্য কোন উপায় নেই।'

আশরাফের অস্বস্তি এক পলকে উদ্বেগে পরিণত হলো, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। 'এটা কোন উত্তর হলো না!'

'জানি। সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।'

ছয়

সাতটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এই সময় সোহানা দেখল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা শাখা উপত্যকা থেকে আশরাফকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে পাইথন। কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকটায় নিজেরা আরাম ও আয়েশের সঙ্গে বসবাস করছে পাইথন আর তার দল। গেটে সশস্ত্র প্রহরী আছে। কি বিষয়ে যেন অনর্গল কথা বলছে আশরাফ, ঘন ঘন হাত নাড়ছে।

একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে সোহানা, বড় একটা আলগা পাথর তুলে ছুঁড়ে দিল এক

পাশে। আড়চোখে লক্ষ করল, পাইথনের হাঁটাচলার মধ্যে নতুন কি যেন একটা আছে। এখনও বেশ অনেক দূরে ওরা, তারপরও পাইথনের হাসির আওয়াজ পরিষ্কার ভেসে এল। ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে সে, হাসির দমকে ঝাঁকি খাচ্ছে প্রকাণ্ড শরীর। হঠাৎ যেন নতুন প্রাণশক্তি এসে গেছে তার মধ্যে। বিপদ সঙ্কেত পেয়ে সোহানার ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল।

তিনশো গজ দূরে দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে কাজ করছে রানা, প্রাচীন বাজার এলাকায়। সোহানার বাম দিকে, খানিকটা পিছনে, আগের মত আজও প্র্যাকটিস করছে কোর্সিনেজ। আর্কিওলজিকাল টীমের কয়েক-জন তরুণও কাছাকাছি মাটি খুঁড়ছে। বালি, মাটি ও পাথরের উঁচু একটা পাহাড়ে উঠে আসছে পাইথন, এখনও হড়বড় করে কথা বলছে আশরাফ। পাহাড়ের মাথায় উঠে এক সেকেন্ড দাঁড়াল পাইথন, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করতে এক সেকেন্ড দেরি করল আশরাফ, তারপর হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সিধে হলো সে, তবে একটা পা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে অপর পায়ে লাফাতে শুরু করল, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। তার কাতর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল সোহানা।

'আমার পা! আমার পা মচকে গেছে! বাবারে! মারে! আশ্চর্য, আপনি হাসছেন!'

ঘুরে দাঁড়াল কোর্সিনেজ, দূরের দৃশ্যটা দেখছে। ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকাল সে, তারপর আবার ফিরল তক্তাটার দিকে, হাতে বাগিয়ে ধরে আছে তলোয়ারটা। তক্তায় আঁকা টার্গেটে হামলা করতে যাবে, হঠাৎ শুনতে পেল, 'স্টুপিড বাস্টার্ড! সারাটা দিন কাঁটা চামচ নিয়ে মরা কাঠের ওপর বীরত্ব ফলাচ্ছে!' ঝট করে মাথা ঘোরাল সে। দেখল, চোখে আগুন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোহানা।

ট্রেঞ্চের পাশে আরেকটা পাথর রাখল সোহানা, কোর্সিনেজের দিকে পিছন ফিরল। এক সেকেন্ড পর আবার গলাটা শুনতে পেল কোর্সিনেজ, 'অ্যামেচার আর বলে কাকে! তা না হলে সারাদিন ন'ঘণ্টা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! শালা কাপুরুষ!'

তক্তার দিকে ঘুরতে যাচ্ছিল কোর্সিনেজ, স্থির পাথর হয়ে গেল। গলাটা সোহানার, এতক্ষণে নিশ্চিত হলো সে। রাগে গরম হয়ে উঠল তার শরীর। প্রায় হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এল সে, ট্রেঞ্চের কিনারায় থমকে দাঁড়াল, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমাকে তুমি কিছু বললে?' তার গলায় অবিশ্বাস।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোহানা, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর আরেকটা পাথর তোলার জন্যে ঝুঁকল।

ওর কাঁধের ওপর বাতাসে শিস কাটল তলোয়ারটা। 'আমাকে কিছু বললে তুমি?'

ছোট একটা লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এল সোহানা, ওপার থেকে সরাসরি কোর্সিনেজের দিকে তাকাল, চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে। পনেরো গজ দূরে একটা বোল্ডারের ওপর থেকে সিধে হলো একজন গার্ড, হাতের সাবমেশিনগান

সরাসরি সোহানার দিকে তাক করল।

মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল কোর্সিনেজ। মেয়েটার আচরণে এমন কিছু একটা আছে, প্রচণ্ড ঘৃণা ও রাগে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে তার রক্ত। 'কি বললে তুমি?' তীক্ষ্ণ, কর্কশস্বরে গর্জে উঠল সে।

ধীরে ধীরে রাগের ভাবটা সোহানার চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল, যেন কোর্সিনেজ খেপে ওঠায় ভয় পেয়েছে ও। 'বোধহয় কিছু চিন্তা করছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি শুনে ফেলেছ।'

'কি চিন্তা করছিলে?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল কোর্সিনেজ।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সোহানা, চোখ মিটমিট করল বার কয়েক, তারপর অলসভঙ্গিতে একটা হাই তুলল।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে তলোয়ার চালাল কোর্সিনেজ, চাবুকের মত। বাতাসে শিস কাটল ফলাটা। দেখা গেল, চোখের পলকে সরে গেছে সোহানা, সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। ছুটে এল কোর্সিনেজ, পরমুহূর্তে আবার তলোয়ার চালাল। দ্বিতীয়বারও টার্গেটকে নাগালের মধ্যে পেল না সে।

লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চের এপারে চলে এল কোর্সিনেজ, তার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। শয়তান মেয়েটাকে আজ দু'টুকরো করে ফেলবে সে।

দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে সোহানা, উঁচুনিচু মাটির ওপর যেন একটা বিড়াল। হোঁচট খেতে খেতে সামনে বাড়ছে কোর্সিনেজ। এগিয়ে আসছে গার্ডটাও, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব, সাবমেশিনগানটা নিচের দিকে তাক করা। গোটা দৃশ্যটা যে-কোন মুহূর্তে বীভৎস হয়ে উঠতে পারে। সোহানা শান্ত, তবে অসম্ভব ক্ষিপ্র। কোর্সিনেজ রাগে ফুঁসছে, সোহানাকে নাগালে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হাত দুটো পিছনে সোহানার, পিছু হটছে, লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে একপাশে, প্রতিটি আঘাত এখনও এক-আধ ইঞ্চির জন্যে এড়িয়ে যাচ্ছে ও। দু'বার মরতে মরতে বেঁচে গেল সোহানা। তলোয়ারের সরু ডগা ছুঁয়ে দিল একবার ওর পাঁজর, আরেকবার ওর পা। সোহানা ধারণা করল, নিশ্চয়ই সব দেখতে পাচ্ছে পাইথন। অন্তত কোর্সিনেজের শেষ চিৎকারটা তার কানে না গিয়ে পারে না। হ্যাঙ্গেরিয়ান মেজর আবার ছুটে এল, নিজের ভাষায় গালিগালাজ করছে সোহানাকে।

পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গম গম করে উঠল পাইথনের গলা, 'মেজর কোর্সিনেজ! ক্ষান্ত হও, ইফ ইউ প্লীজ।' কিন্তু আবার হিসহিস করে উঠল কোর্সিনেজের তলোয়ার। আবার যখন কথা বলল পাইথন, মনে হলো অনেক কাছে চলে এসেছে সে, তবে গলাটা শান্ত ও কৌতুকময় লাগল সোহানার কানে। 'তোমার আবেগের রাশ টেনে ধরো, কোর্সিনেজ, তা না হলে তোমার মাথাটা পাথরে ঠুকে কাদা বানিয়ে ফেলব আমি।'

স্থির হয়ে গেল কোর্সিনেজ, হাঁপাচ্ছে, ধীরে ধীরে নিচু করল হাতের তলোয়ার।

এগিয়ে এল পাইথন, তাড়াহুড়ো করছে না, অথচ প্রকাণ্ড পা দুটো অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে দূরত্বটুকু পেরিয়ে এল। তার পিছু পিছু প্রায় ছুটে আসতে হলো

আশরাফকে, তবে মনে রেখেছে খোঁড়াতে হবে।

'ওহ্, ডিয়ার মি!' পাইথনের গলায় উল্লাস। 'কি ঘটছে এখানে? বীরোত্তম মেজর কোর্সিনেজকে অপমান, সোহানা চৌধুরী?'

সোহানার ওপর এখনও স্থির হয়ে আছে কোর্সিনেজের চোখ, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। 'কুত্তীটা···আমাকে অপমান করেছে!' কথা বেধে যাচ্ছে তার মুখে।

'অসম্ভব!' কৃত্রিম আতঙ্কে শিউরে উঠল পাইথন। 'এ অসম্ভব!'

'আমি বলছি কুত্তীটা আমাকে অপমান করেছে!'

সোহানার দিকে তাকাল পাইথন। 'সত্যি? অভিযোগটা সত্যি? কোর্সিনেজের মত একজন বীরপুরুষকে তোমার মত একটা অবলা নারী কিভাবে অপমান করতে পারে? এ আমি কিভাবে বিশ্বাস করব!'

চোখের ওপর একটা হাত ঘষল সোহানা। 'ওর হাতের ওই তলোয়ারটা,' ওর গলায় তীব্র ঝাঁঝ। 'সারাদিন, প্রত্যেক দিন, বাতাসে শুধু নাড়ছে আর নাড়ছে! এ অসহ্য!'

কোর্সিনেজের গলার সব ক'টা রগ ফুলে উঠল। 'নাড়ছে? বাতাসে নাড়ছে?' গলার আওয়াজ শুনে মনে হবে বিস্ময়ে আহত বোধ করছে পাইথন, কিন্তু কুৎসিত মুখে হাসির কমতি নেই। 'মাই ডিয়ার সোহানা চৌধুরী, বিখ্যাত একজন ফেনসিং মাস্টার সম্পর্কে এ ভাষায় কথা বলা উচিত নয় তোমার।'

'বিখ্যাত কি?' সোহানার উচ্চারণ ভঙ্গিতে এমন ঘৃণা ঝরে পড়ল, শব্দ দুটো যেন ক্ষুরের মত ধারাল। হিসহিস করে শ্বাস টানল কোর্সিনেজ, তলোয়ারটা বিদ্যুৎবেগে মাথার ওপর তুলল সে।

পাইথন বলল, 'নো।' শান্ত নির্দেশ, কিন্তু হাতুড়ির বাড়ির মত আঘাত করল কোর্সিনেজকে। তলোয়ার নিচু করল সে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল পেনিফিদারকে, একটা হাত ধরে জেনিকে টেনে আনছে সে। তার পাঁশুটে মুখে এখনও রোদ লাগেনি, পরনের সাদা শার্টটা সদ্য ইস্ত্রি করা। ধমকের সুরে জানতে চাইল, 'কি ঘটছে এখানে?'

'আমাদের সোহানা চৌধুরী মেয়েলি বদমেজাজের শিকার হয়ে পড়েছে,' সকৌতুকে বলল পাইথন। 'কোর্সিনেজের পারফরম্যান্স দেখে বেচারার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা স্নায়ু-বিদারক। কিন্তু মেজর কোর্সিনেজের মনে হয়েছে, তাকে অপমান করা হয়েছে।'

ম্লান, নিষ্প্রাণ চোখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'কিল হার,' অকস্মাৎ নির্দেশ দিল সে। 'হারামজাদীর কোন কুমতলব আছে। কোর্সিনেজ, ঝামেলা শেষ কর—এই মুহূর্তে।'

'এটা কি তোমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত?' সাগ্রহে জানতে চাইল পাইথন, যেন পেনিফিদারের সিদ্ধান্ত তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তুমি ঠিক জানো, সোহানা চৌধুরী কোন ফন্দি আঁটছে?'

পেনিফিদার আবার বলল, 'কিল হার!'

'সত্যি কথা বলতে কি, সোহানা চৌধুরী বা মাসুদ রানা যদি কোন মতলব আঁটত, ভারি খুশি হতাম আমি,' খেদ প্রকাশের সুরে বলল পাইথন। 'কিন্তু না, আমাকে ওরা এত ভয় পায় যে কিছু করার কথা ভাবতেই পারছে না। আমার ধারণা, পেনিফিদার, তুমি একটু বেশি সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছ। নারী, ঈশ্বর ওদের ওপর করুণা বর্ষণ করুন, দুর্বল প্রজাতির জীব। এমন কি সোহানা চৌধুরীর মত নারীও, নেহাতই অবলা প্রাণী; বিশেষ করে আমি যেখানে উপস্থিত আছি। বাতাসে তলোয়ার নাড়তে দেখে তার নার্ভে টান পড়েছে। ব্যাপারটা নেহাতই হাস্যকর মেয়েলি দুর্বলতা নয় কি? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এ-ব্যাপারে ফ্রয়েডীয় একটা ব্যাখ্যা না থেকেই পারে না।'

'কিল হার,' আবার হিসহিস করে উঠল পেনিফিদার, এবার তার গলায় রাগ। 'তুমিই মারো ওকে, পাইথন। এখুনি।'

মাথা নাড়ল পাইথন। 'কারও আনন্দ-ফুর্তিতে বাগড়া দেয়া উচিত নয়, পেনিফিদার। প্রতিটি অনুষ্ঠানের একটা সূচী থাকা দরকার। প্রথমে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা, তারপর পরিস্থিতির উত্তেজক স্বাদ গ্রহণ, সবশেষে বিদায় সম্বর্ধনা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পদ্ধতি ও কর্মসূচী থাকে। আমারটা কি, তুমি তা জানো। তাছাড়া, পেনিফিদার,' তার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের কথা কখনও ভুলো না। গুপ্তধন মাটির ওপর তোলা হলে তোমার নিজস্ব পদ্ধতিতে যা খুশি করতে পারো তুমি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কর্তব্য পালনের ধারায় আমি খানিকটা বৈচিত্র্য, স্টাইল ও জাঁকজমক আনতে চাই।'

রাগে পেনিফিদার কথা বলতে পারল না।

সোহানার দিকে তাকাল পাইথন। তার গলায় শান্ত বিনয়, 'যে-কোন বিচারে আমাদের মেজর কোর্সিনেজ দুনিয়ার অন্যতম সেরা সোর্ডসম্যান। তাকে তুমি ছোট করার চেষ্টা করেছ, তুচ্ছ বলতে চেয়ে উপহাস করেছ। এমন হতে পারে, এমন হওয়া কি আদৌ সম্ভব যে তার নৈপুণ্য ও দক্ষতা তুমি উপলব্ধি করতে পারোনি?'

হাত ঝাপটা দিয়ে ভুরু থেকে চুল সরাল সোহানা। 'ওর দক্ষতা বা নৈপুণ্য সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।' চট করে একবার কোর্সিনেজের দিকে তাকাল ও, তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'তবে আমার সন্দেহ আছে তক্তাটা এখনও কাটা হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওটারই একটা টুকরো দিয়ে মেরে তক্তা বানানো যায় ওকে।'

এক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। জেনির মুখ সাদা হয়ে গেছে, কোর্সিনেজের মুখও, তবে কারণটা আলাদা। মনে মনে চিৎকার করছে আশরাফ, 'ইয়াল্লা। সোহানা থামো, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ!'

তারপর, কোর্সিনেজ নড়ে উঠতেই, গলা ছেড়ে হেসে উঠল পাইথন। তার বিরাট, অবিশ্বাস্য লম্বা হাতটা ঝট করে সামনে বাড়ল, খপ করে ধরে ফেলল কোর্সিনেজের একটা কাঁধ। 'না! না, মেজর কোর্সিনেজ!' অদম্য হাসির ফাঁকে কথা বলছে সে। 'আমি স্বীকার করতে বাধ্য, স্বীকার না করে আমার উপায় নেই যে সোহানা চৌধুরী তোমাকে খোঁচাচ্ছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এই অপমানের প্রতিশোধ

নিতে চাইবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে, নয় কি?'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে পাইথনের দিকে তাকাল কোর্সিনেজ। খুনের নেশাটা চোখ থেকে মিলিয়ে গেল, তার বদলে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ব্যাকুল একটা আগ্রহ। 'উপযুক্ত পদ্ধতিতে?' খসখসে গলায় জানতে চাইল সে।

'তোমার কাছে তলোয়ার আছে দুটো, আমার বিশ্বাস।' কোর্সিনেজের কাঁধ থেকে হাতটা নামাল পাইথন। 'ডুয়েল, মেজর কোর্সিনেজ। ভারি উপভোগ্য হবে বলেই আমার ধারণা। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ তুমি আমার একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান করে দিয়েছ। মাসুদ রানার বিদায়-সম্বর্ধনাটা কি রকম হবে, সে আমি ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু সোহানা চৌধুরীকে নিয়ে কি করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। ডুয়েল, ঠিক আছে? প্রায় অনুভব করতে পারছি তোমার ছোট্ট গোলাপী হৃৎপিণ্ডটা উল্লাসে লাফাতে শুরু করেছে, মেজর কোর্সিনেজ।'

ক্ষীণ ব্যঙ্গটুকু খেয়াল করল না কোর্সিনেজ, একদৃষ্টে সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, উত্তেজনায় ও উল্লাসে ঘামছে তার মুখ। 'কখন?' ফিসফিস করল সে।

চোখ তুলে আকাশটা একবার দেখে নিল পাইথন। 'দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে। তাছাড়া, ঠিক কি ঘটবে কল্পনা করার জন্যে আমাদের সবারই একটু সময় পাওয়া উচিত—আমি জানি, অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত উত্তেজক হবে। আমি এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ সন্ধেবেলা ওদের যে যত্ন নেয়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করা হলো। সোহানা চৌধুরী আর তার বন্ধুরা যাতে আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ডুয়েলের পরিণতি কল্পনা করে পুলকিত হবার সুযোগ পায়। তাহলে কাল, কেমন? কাল এই সময়ের এক ঘণ্টা আগে। প্রাচীন অ্যারেনায়, কেমন?'

এক পা সামনে বাড়ল পেনিফিদার। তার চোখের সাদা অংশটুকু রাগে লালচে হয়ে আছে। 'তুমি পাগল হয়ে গেছ, পাইথন,' কর্কশস্বরে বলল সে। 'হতে পারে কোর্সিনেজ অন্যতম সেরা, কিন্তু তবু সোহানার হাতে খুন হয়ে যেতে পারে সে!'

আহত হবার ভান করল পাইথন। 'ওহ্ ডিয়ার মি, নো! মেজর কোর্সিনেজ ইস্পাতের জাল দিয়ে বানানো জ্যাকেট পরে থাকবে।'

পেনিফিদারের রাগ পানি হয়ে গেল, নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল সে।

এখনও সোহানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কোর্সিনেজ, ওদের কথা শুনে তার চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব ফুটল। 'না, প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখ্যান করছি। মেশ জ্যাকেট পরার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'নেই যে আমি তা জানি,' একমত হলো পাইথন, হাসছে। 'তবু ওটা তুমি পরবে, কোর্সিনেজ, শুধু আমাকে খুশি করার জন্যে।'

'সব শালা কাপুরুষ!' হঠাৎ গমগম করে উঠল রানার ভরাট কণ্ঠস্বর। 'একটা মেয়ের সঙ্গে লড়তে বলছ ওকে, তোমাদের লজ্জা করছে না?' কোর্সিনেজের দিকে তাকাল ও, সোহানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'সাহস থাকে তো আমার সাথে লড়ো, দেখব কেমন ফেনসিং মাস্টার তুমি।'

'রানা, তুমি চুপ করো!' দ্রুত বলল সোহানা, খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল ওর।

'ওর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম,' ঘোষণার সুরে বলল কোর্সিনেজ। 'তবে প্রথমে আমি কুত্তীটাকে উচিত শাস্তি দিতে চাই।'

হাতটা ঝাপটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল রানা, তাকিয়ে আছে কোর্সিনেজের দিকে। 'তুমি একটা বেজন্মা! একজন ভদ্রমহিলার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখোনি। সাহস থাকলে আগে তুমি আমার সাথে লড়বে, তারপর যদি শক্তি থাকে তো সোহানার সাথে লড়ো।'

'না!' প্রতিবাদ করল সোহানা। 'বিরোধটা ওর সাথে আমার, তোমার সাথে ওর নয়, রানা। এটা আমার লড়াই, আমাকে লড়তে দাও।'

'এ-ব্যাপারে পেনিফিদারের বক্তব্য কি?' উৎফুল্ল পাইথন প্রশ্ন করল। 'শত্রু শিবিরে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, আমরা ওদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমার ধারণা, রানাকে তুমি নিজের জন্যে রিজার্ভ রাখতে চাও। তোমার আনন্দে আর কেউ ভাগ বসাক, এ তুমি মানবে বলে মনে হয় না।'

'ধন্যবাদ, পেনিফিদার। আমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোয় তোমার ওপর খুশি আমি।' হাসছে পাইথন। 'সত্যি আমি দুঃখিত রানা—কোর্সিনেজের হাতে তোমার মৃত্যু নেই। তোমাকে মরতে হবে আমার হাতে। এটা তোমার নিয়তির লিখন, মেনে নাও।'

ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছে সোহানা, রানার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'প্লীজ, রানা!'

'এ তুমি কি করলে?' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, কারও দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছে, কাঁধ ও ঘাড়ের পেশী লোহার মত শক্ত।

মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যরা সোহানার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কমনরূমের দরজা বন্ধ হবার পর রাতের খাবার খেল ওরা, যে যার বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়ল। মিসেস হোয়াইটস্টোন তাঁর স্বামীর বিছানায় বসে রয়েছেন।

ছোট কামরাটায় বসে রয়েছে আশরাফ, বিড়বিড় করে বলল, 'বলতে চাইছ আর কোন উপায় ছিল না?'

'ছিল না, আশরাফ, তোমাকে তো আগেই আমি বলেছি।'

'কিন্তু বলোনি একজন ফেনসিং ফ্যানাটিকের টার্গেট হবার মত বোকামি করতে যাচ্ছ! তুমি আর জেনি, এমনকি রানাও, অ্যাকুয়েডাক্ট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতে আজ রাতে। কিন্তু না, শুধু পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চ কোথায়। যেচে পড়ে বিপদ ডেকে আনার মধ্যেই না বীরত্ব।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'তোমার বুঝি তাই ধারণা?'

'আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না! নিজেকে তুমি বিপদে ফেলছ, কিন্তু তাতে লাভটা কি হচ্ছে?'

'লাভ হচ্ছে এই যে এখান থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে পারব আমরা।'

'কিভাবে, ব্যাখ্যা করো। আর সবাইকে মানেটা কি?'

'মানে হলো আমরা চারজন আর আর্কিওলজিকাল টিমের সদস্যরা।'

'কিভাবে?'

'কিভাবে সেটা তোমাকে শুধু রানা ব্যাখ্যা করে বলতে পারে,' জবাব দিল সোহানা। 'সবার দৃষ্টি আমার দিকে টেনে আনছি আমি, এটা আমার প্ল্যানের একটা অংশ বিশেষ। আমার ধারণা, রানারও একটা প্ল্যান আছে। দুটো প্ল্যানই সফল হওয়া চাই; তবেই আমরা সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

সোহানার বিছানাতেই বসে রয়েছে রানা, কিন্তু কারও দিকে তাকাচ্ছে না বা কথাও বলছে না। ওর দিকে তাকাল আশরাফ, তবে গম্ভীর চেহারা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না তার।

সোহানা বলল, 'সব কথা তোমার না জানাই ভাল, আশরাফ। ভান করতে না হলে তোমার আচরণ যেমনটি হওয়া দরকার ঠিক তেমনটি হয়। সত্যি বলছি। খানিক আগে আমি যখন কোর্সিনেজকে ফাঁদে ফেলছিলাম, তোমার চেহারাটা হয়েছিল মিলিয়ন পাউন্ড চুনির মত। তোমার ওই চেহারা দেখেই পাইথন বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা আমরা সাজাইনি।'

নিজের বিছানায়, মাথার পিছনে হাত রেখে শুয়ে রয়েছে সোহানা। আশরাফ বসে আছে জেনির বিছানায়, পাশাপাশি। শার্টের আস্তিন দিয়ে ভেজা মুখটা মুছল আশরাফ, আড়চোখে রানার দিকে তাকাল একবার। সরাসরি প্রশ্ন নয়, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, বিড় বিড় করল, 'কে জানে কাল এই সময় আমাদের মধ্যে সোহানা থাকবে কিনা।'

'স্টপ দ্যাট!' ধমক দিল সোহানা। 'কল্পনা শক্তিটাকে বরং অন্য কোন কাজে লাগাও, আশরাফ।'

শান্ত গলায় জেনি বলল, 'আমার এত ভয় লাগছে যে কথা বলতে পারছি না। সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। তবে বুঝতে পারছি, ঢিল একবার ছোঁড়া হয়ে গেছে, ওটাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। চেষ্টা করলেও এখন আর লড়াইটা বাতিল করা যাচ্ছে না। কাজেই সোহানাকে উত্যক্ত করাটা ঠিক হবে না, আশরাফ।'

মরিয়া হয়ে এবার সরাসরি রানার দিকে তাকাল আশরাফ। 'রানা, তুমি কিছু বলবে?'

'আরেকটু অন্ধকার হলেই অ্যাকুয়েডাক্টে নামব আমি,' শান্ত, থমথমে গলায় বলল রানা। 'আজ আমি অনেকক্ষণ থাকব ভেতরে। ফিরে এসে ধনুকের বাকি কাজটুকু শেষ করব। তুমি, আশরাফ, আমি যে ছুরিটা পেয়েছি সেটার জন্যে একটা হাতলের ব্যবস্থা করবে। হাতলটা কিভাবে ফলার সঙ্গে বাঁধতে হবে, দেখিয়ে দেব আমি। আরেকটা কথা, কাল তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটার কথা মনে রেখো, তা না হলে সন্দেহ করবে পাইথন। জেনি, তোমারও একটা কাজ আছে। স্লিংটা দেখেছ তো? ওটার কিনারা চামড়া দিয়ে মুড়তে হবে।'

'বেশ, ঠিক আছে,' অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল আশরাফ। 'কিন্তু আমি জানতে চাইছি, সোহানা কি কাজটা ভাল করেছে?'

'এখন আর সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই,' বলল রানা। 'কাজটা কেন করেছে ও,

আমি জানি। তারমানে এই নয় যে এতে আমার সায় আছে। তবে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাইছি না, কারণ একটা পর্যায় পর্যন্ত পরিস্থিতি আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে, জেনি।'

'তার আগে আমারও কিছু বলার আছে।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকল জেনি।

'বেশ, আগে তোমার কথা শোনা যাক।'

ক্লান্ত দেখাল জেনিকে। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'ব্যাপারটা খারাপ নাকি ভাল, বলতে পারছি না। তবে তোমাদের শোনা উচিত। কাল আমি ওদেরকে জানাব, গুপ্তধন পাওয়া গেছে।'

'গুপ্তধন পাওয়া গেছে!' প্রায় আঁতকে উঠল আশরাফ। 'কি করে জানলে তুমি?'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, গুপ্তধন পেয়েছ কিনা। পেয়েছ যে বুঝলে কিভাবে?'

'শিরশির ভাবটা কাল ও আজ, দু'দিনই অনুভব করেছি আমি,' বলল জেনি। 'জমিনের শেষ অংশে, বাজার এলাকার এক কোণে।'

হঠাৎ কেউ কোন কথা বলল না, তারপর রানা জানতে চাইল, 'অনেক গভীরে?'

'না···খুব গভীর হলে এতটা শিরশির করত না। এখন বলো, কি করলে ভাল হয়?'

বিছানার ওপর উঠে বসল সোহানা, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, সবাই অপেক্ষা করছে। তারপর বলল ও, 'কিছুই গোপন কোরো না, জেনি। ওদেরকে জানাও। তবে একটা বিশেষ সময়ে জানাতে হবে ওদেরকে···এই ধরো, কাল ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট আগে।'

বুকের ভেতর আশরাফের হৃৎপিণ্ড ছোট্ট একটা লাফ দিল। ছ'টার কয়েক মিনিট আগে! তারমানে সোহানার সঙ্গে কোর্সিনেজের লড়াই শুরু হবার কয়েক মিনিট বাকি থাকতে! জেনির ঘোষণা পাইথনের মনোযোগ কেড়ে নেবে। সেই মুহূর্তে বাকি আর কিছুরই কোন গুরুত্ব থাকবে না···।

'তাতে অবশ্য পাইথন তার পরিকল্পনা বাতিল করবে না,' বলল রানা, শূন্যে তাকিয়ে আছে, কথাগুলো যেন ওর চিন্তার অংশবিশেষ। 'সন্ধের খানিক আগে, কাজেই তখুনি মাটি খুঁড়তে চাইবে না সে··· বিশেষ করে, জেনি, তুমি যদি বলো যে মাটির অনেকটা গভীরে আছে ওগুলো। হ্যাঁ, তাই বলবে। তুমি পেয়েছ, এতে সাংঘাতিক খুশি হবে সে। খবরটাকে সে অতিরিক্ত আনন্দ হিসেবে নেবে।'

আশরাফ অনুভব করল তার পেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে, বমির ভাবটা ঠেকাবার জন্যে দাঁতে দাঁত চাপল সে। বলল, 'কিন্তু ওদেরকে জানাবার দরকারটা কি?'

'সাথে সাথে ওদের দৃষ্টি আমাদের ওপর থেকে সরে যাবে। অন্য কোন ব্যাপারে তেমন মনোযোগ দেবে না। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে এক বা দু'জন গার্ডও কমবে, কারণ পাইথন অবশ্যই বাজার এলাকায় পাহারার ব্যবস্থা

করবে, অন্তত পেনিফিদারকে সে বিশ্বাস করে না এ-কথা বোঝাবার জন্যে। আর সবার মত, পেনিফিদারকে খুঁচিয়েও আনন্দ পায় সে।'

জেনি বলল, 'পেনিফিদার চাইবে চারদিকে ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বেলে সারারাত মাটি খোঁড়া হোক।'

আশরাফের দিকে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ। কিন্তু পাইথন তা চাইবে না। ভিক্টর ক্যানিঙের কাছ থেকে জেনেছে সে, আমাদের খোঁজে এখানে কেউ আসার আগে আনন্দ-ফূর্তি করার জন্যে অন্তত হপ্তা দুয়েক সময় পাবে সে। আর গুপ্তধন মাটির ওপর তোলা হয়ে গেলেই তার মাতব্বরি শেষ, দায়িত্ব তুলে দিতে হবে পেনিফিদারের হাতে। পাইথনকে আমি যতটুকু বুঝি, প্রথমে সে তার আনন্দটুকু পেতে চাইবে।'

ক্লান্ত দেখাল আশরাফকে। 'তার আনন্দ। হ্যাঁ। তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ।'

কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ লক্ষ করল আশরাফ, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। দৃষ্টিটা জেনির ওপর পড়ল, তারপর আবার ফিরে এল তার ওপর। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, একটা হাত ধরল জেনির। চেষ্টা করে এমন এক খুশির সুরে কথা বলল সে, মনে হলো যেন কত যুগ আগে এই সুরে কথা বলত। 'আমি স্যান্ড-বাথ নিতে যাচ্ছি। আমার পিঠে বালি ঘষে দেয়ার দুর্লভ সুযোগটা লটারিতে জিতে নিয়েছে মিস জেনি উডহাউস। ব্যবহার করা বালি পরে বিশ টাকা দরে প্রতি চামচ ভক্তদের মধ্যে বিক্রি করা হবে।'

মৃদু হাসির শব্দ বেরুল জেনির গলা থেকে, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানোর আওয়াজে পরিণত হয়ে থেমে গেল সেটা। তাড়াতাড়ি বলল সে, 'দুঃখিত।' দ্রুত দাঁড়াল, আশরাফের হাত ধরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ওরা চলে যেতে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল সোহানা, চোখ বুজল। একটু পর বলল, 'ওদেরকে শান্ত রাখার দায়িত্বটা তোমার, রানা। কাজটা আমি করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু···।'

রানা কিছু বলছে না দেখে চোখ খুলল সোহানা। ওর মনে হলো, কথাটা শুনতে পায়নি। মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করছে রানা। একটু পর শান্ত গলায় বলল, 'বিপদটাকে আমার দিক থেকে নিজের দিকে টেনে নিলে, কিন্তু তাতে লাভটা কি হবে, সোহানা?'

'আমার ওপর রাগ কোরো না, প্লীজ। এ সবদিক থেকে ভাল হয়েছে। আমার ওপর কোর্সিনেজের কোন সাইকোলজিক্যাল ডমিনেশন নেই।'

মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'তলোয়ার তার প্রিয় অস্ত্র। ফেনসিং তার নেশা। কিন্তু তোমার শুধু শখ, সোহানা। এ-পর্যন্ত যত লোকের সাথে তুমি খেলেছ, তাদের সবার চেয়ে ভাল করবে ও।'

'হ্যাঁ, ভাল একজন ফেনসার। তারমানেটা কি? জাস্ট ফিগার হাউ দ্যাট লিমিটস্ হিম।'

খুবই ধীরে ধীরে চিন্তার রেখাগুলো রানার মুখ থেকে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। চোখে উদ্বেগের বদলে চকচকে একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ভাল একজন

ফেনসার মানে কেতাবের নিয়ম ধরে খেলবে ও।' সামান্য হাসল, তারপর নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু হারামজাদা স্টীল জ্যাকেট পরে থাকায় বিরাট একটা সুবিধে পাবে। পারবে তো, সোহানা?'

'পারব কিনা তা আমি ভাবছি না,' বলল সোহানা। 'আমি জানি আমাকে পারতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আর সব কিছু বাদ দিলেও, সোহানার এই গুণটা গর্বিত করে তোলে ওকে। এই গুণের প্রয়োগ ঘটবার প্রয়োজন খুব কমই দেখা দেয়, তবে যখন দেখা দেয় তখন সোহানার মধ্যে কোন দ্বিধা থাকে না, থাকে না আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব। কাউকে খুন করা যখন একান্ত জরুরী হয়ে ওঠে, অত্যন্ত দক্ষ ও কৌশলী হয়ে ওঠে সোহানা। অনেকেই হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারবে না, যারা কখনও অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। 'তোমার জায়গায় আমি লড়তে চাই, এ-কথা বলে এখন আর কোন লাভ নেই। ব্যাপারটা যখন ঘটিয়েই ফেলেছ, ধরে নাও তোমার প্রতি আমার সমর্থনই আছে। তবে, আমিও তৈরি থাকব।' কিসের জন্যে তৈরি থাকবে, খোলসা করে বলল না রানা, লড়াইয়ের আগে খারাপ দিকটা সোহানাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে না। 'আরেকটা কথা। যদি সুযোগ পাও, তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে।'

'কথা দাও ভাল হলে অস্কার পাব,' বসল সোহানা, রানার কাঁধে চিবুক রাখল।

'তার চেয়েও বড় পুরস্কার, আমরা সবাই পুনর্জীবন লাভ করব,' বলল রানা।

'বেশ। বলো, কি ধরনের অভিনয় করতে হবে? কার সাথে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'ক্রনেলের সাথে।'

'ক্রনেলের সাথে···,' সোহানা নয়, হেসে উঠল ওর চোখ দুটো। 'ও, আচ্ছা। বুঝতে পারছি কি অভিনয় করতে হবে, রেন করতে হবে। এটাই তাহলে তোমার প্ল্যান!'

'পারবে?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নির্ভর করছে টোপটা ক্রনেল নেয় কিনা তার ওপর। আমার ধারণা, নেবে। ওদের মধ্যে একমাত্র তার দৃষ্টিতেই নোংরামি লক্ষ করেছি আমি।'

'আমিও,' বলল রানা। 'সেজন্যেই কাজটা দিতে চাইছি তোমাকে।'

'এবার তোমার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করো, রানা। আমি জানি, অন্যের লেখা হুবহু নকল করতে পারো তুমি।'

হেসে ফেলল রানা। 'তাহলে আর আমার ব্যাখ্যা করার থাকল কি, সবই তো বুঝে ফেলেছ।'

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'দুটো প্ল্যানই যদি সফল হয়, তাহলে কি ঘটবে?'

'কাল রাতে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'সবাইকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। রানা সোহানার প্ল্যান নিয়ে চিন্তা করছে, সোহানা রানারটা নিয়ে। সোহানার প্ল্যানটা সফল হবে কিনা নির্ভর করছে

কালকের জীবন-মরণ লড়াইটার ওপর। কোর্সিনেজ খুন করবে সোহানাকে, নাকি সোহানা খুন করবে কোর্সিনেজকে।

ত্রিশ মিনিট পর অ্যাকুয়েডাকট-এ নামল রানা। আশা করছে টানেল থেকে অপরপ্রান্তে বেরুতে পারবে ও, জরুরী কয়েকটা কাজও সেরে আসবে। এবারও কাপড় পরল না, তবে বড় একটা চাদর জড়িয়ে নিল শরীরে, মুখে ছাই মাখল খানিকটা। অস্ত্র বলতে ছুরি, লোহার ছেনি, আর জোড়া লাগানো এক প্রস্থ রশি নিল রানা। ছেনিটা মাটি ও বালি সরাবার কাজে লাগবে।

মাত্র দুটো শাখা অ্যাকুয়েডাকটে এসে মিলিত হয়েছে, প্রথমবারের মত এবারও ওগুলোকে পাশ কাটাল রানা, মেইন চ্যানেলটা ধরে এগোল। ঘনঘোর অন্ধকারে দ্রুত এগোল ও, দু'মিনিট পরপর ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল। অবশেষে বাধাটার সামনে এসে স্থির হলো।

মাটি আগেই সরিয়ে রেখে গেছে রানা, এবার হাত দিয়ে পাথর সরাতে শুরু করল। আলগা পাথর, সরাতে অসুবিধে হলো না, কিন্তু সংখ্যায় এত বেশি যে কোথায় রাখবে ভেবে পেল না ও। পিঠের ওপর দিয়ে যদি পিছন দিকে ফেলে, ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। খানিক চিন্তা করে শরীর থেকে চাদরটা খুলে ফেলল ও। নিজের সামনে ভাঁজ খুলল যতটা পারা যায়, আট-দশটা পাথর রাখল সেটার ওপর, চাদরে মুড়ে পিছু হটতে শুরু করল। তেমাথায় এসে শাখা অ্যাকুয়েডাকটের ভেতর ঠেলে দিল পাথরগুলো। এভাবে চারবার আসা-যাওয়া করতে হলো ওকে। মেইন চ্যানেলের সামনে আর কোন পাথর নেই, তবে মাটি আছে, ছেনি দিয়ে সরাতে হবে।

দশ মিনিট মাটি সরাবার পর সামনে আরেকটা শাখা টানেল পেল রানা। অন্ধকারে হাতড়ে বুঝল, মাটি ও পাথর এটা থেকে গড়িয়ে পড়ে মেইন চ্যানেলটাকে বন্ধ করে রেখেছিল। আরও কিছু মাটি ও পাথর সরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ও। সামনে যত দূর হাত যায়, আর কোন বাধা অনুভব করছে না। তবে অন্ধকার আগের মতই নিশ্ছিদ্র।

বিশ্রাম নেয়ার পর আবার ক্রল করে এগোল রানা। তিন কি চার মিনিট এগোবার পরই অন্ধকারের রঙ বদলে গেল। ভাল করে তাকাতে রাতের কালো আকাশে মিটমিট করতে দেখল কয়েকটা তারাকে। ওর আন্দাজ ভুল প্রমাণিত হয়নি, চ্যানেলটা একটা পাহাড়ী নালার ঢালু গা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। চ্যানেলের মুখের কাছে ইঁটের গাঁথনিও আছে খানিকটা, নালার পানি যাতে চ্যানেলে ঠিকমত ঢুকতে পারে। প্রাচীন মাসের পৌর-কর্তারা সিস্টেমটাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করেই তৈরি করেছিল।

রাতের হিম বাতাসে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল রানা, মুক্তির আকস্মিক অনুভূতিটা পুলক ছড়িয়ে দিল শরীরে। এক মিনিট অপেক্ষা করার পর পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাবধানে এগোল ও। মাসকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের বাইরের দিক এটা।

চারদিক ঘুরেফিরে দেখতে দু'ঘণ্টা সময় নিল রানা, আরও সত্তর মিনিট লাগল

জরুরী কাজটা সারতে। প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক হয়ে থাকল, কারও চোখে ধরা পড়া চলবে না। এয়ারস্ট্রিপে কোন পাহারা নেই। তবে সেসনাটা রাতে যখন এখানে থাকে, তখন নিশ্চয়ই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। উপত্যকার মুখে একজন গার্ড রয়েছে।

প্রথমে রানা সিদ্ধান্ত নিল গার্ডদের পালাবদলটা দেখে যাবে। সময়টা জানা দরকার। হাতে ঘড়ি নেই, তবে ওর সময়-জ্ঞান প্রখর, কখন ক'টা বাজে প্রায় নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। আড়াল থেকে গার্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দশ মিনিট পর্যন্ত লোকটাকে একবারও নড়তে না দেখে সিদ্ধান্তটা পাল্টাল। লোকটা সম্ভবত ঘুমাচ্ছে। কাজেই ওকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার ভেতর ঢোকার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

তবে সত্যি সত্যি ঘুমাচ্ছে কিনা জানার জন্যে আরও কিছুক্ষণ দেখা দরকার। গার্ডের ওপর একটা চোখ থাকল, আশপাশটাও দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল ও। উপত্যকার মুখ থেকে একশো গজ দূরে বড় একটা গুহা রয়েছে। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন যখন আর্কিওলজিকাল টীম নিয়ে এখানে প্রথম আসেন, গুহাটাকে সম্ভবত জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তখন, উপত্যকায় ঢোকার পুরোটা পথ তখনও পরিষ্কার করা হয়নি। এখনও গুহাটাকে পেট্রল স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। খানিকটা এগোল রানা, গার্ডের ওপর চোখ রেখে। তারপর থামল। লোকটা এখনও নড়ছে না। আবার গুহার দিকে ফিরল ও। চাঁদের আলোয় গুহার ভেতরটা আবছাভাবে দেখতে পেল। অনেকগুলো ড্রাম রয়েছে, প্রতিটি ত্রিশ গ্যালনের। সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশটা ড্রাম।

উৎসাহ বোধ করল রানা। বোল্ডারের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আরও কিছুটা সামনে বাড়ল। গার্ডের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে, তবে এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে। গুহার ভেতর কিছু নড়ছে না দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। পেট্রলের গন্ধ পেল নাকে। ড্রামগুলোর পাশে চাকা লাগানো একটা পাম্প, হাত দিয়ে চালাতে হয়। এক জায়গায় অনেকগুলো বাঁশ, কুণ্ডলী পাকানো নাইলনের রশি ও অত্যন্ত হালকা রাবারাইজড নাইলনের ভাঁজ করা শীট-এর একটা স্তূপ, কিনারায় চোখ আকৃতির ফুটো। বোঝা গেল, প্রফেসর হোয়াইটস্টোন প্ল্যান করেছিলেন কাজ করার সময় তাঁর টীমের সদস্যরা যেন রোদ থেকে বাঁচতে পারে। এ-সব বিবেচনাবোধকে প্রশ্রয় দেয়নি পাইথন। গুহার ভেতর আরও রয়েছে একটা ট্রলি। নাকি ট্রেইলর? অন্ধকারে যতটুকু সম্ভব জিনিসটা পরীক্ষা করল রানা। ওটার ওপর হাত বুলাচ্ছে, নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়।

ট্রলিই ওটা, তিনটে চাকার ওপর প্ল্যাটফর্মটা তেকোনা। চাকায় ওগুলো ডেজার্ট টায়ার। পিছনের চাকাদুটো বড়, সামনেরটা ছোট, বসানো হয়েছে একটা টিলার স্টিয়ারিং বার-এর নিচে। মজবুত অ্যাংগল-আয়রনগুলো জোড়া লেগে ত্রিভুজটার ডগা তৈরি করেছে, ওগুলোর মাঝখানে লম্বা একটা ফাঁপা পাইপের গোড়া পেল রানা, ভারা বাঁধার পোল-এর মত। ট্রলির চেসিস, অ্যাংগল-আয়রন ও পোল, এগুলো মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি। অ্যাংগল-আয়রনের মাঝখানে একটা স্টীলের

পিন রয়েছে, সেটার ওপরই পাইপের গোড়াটা স্বচ্ছন্দে ঘোরে। বারো ফুট দৈর্ঘ্য ওটার, খাড়া করা যায়, ঘোরানো যায় যে-কোন দিকে, ব্রেসিং বার-এর সাহায্যে যে-কোন অবস্থানে স্থিরও করা যায়।

মেটাল পাইপের অপরপ্রান্তে হাত দিতে ব্লক ও পুলির অস্তিত্ব টের পেল রানা, বুঝল ট্রলিটাকে দু'ভাবে কাজে লাগানো হয়। সাধারণ একটা মোবাইল ডেরিক। বাহুটা উঁচু করা হলে, সেসনা থেকে অনায়াসে ট্রলিতে স্থানান্তর করা যায় কার্গো। চাকা ঘুরিয়ে যে-কোন জায়গায় নিয়ে আসা যায় ট্রলিটাকে, নিরাপদে কার্গো নামাতে কোন সমস্যা হয় না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। হ্যাঁ, জিনিসটা অদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

এক প্রস্থ নাইলনের রশি হাতে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল রানা, দেখল একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে আছে গার্ড। আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল ও। ব্যাটা নড়ছে না, ভাবল ও, স্রেফ অভ্যেসবশত নয় তো? তারপর ভাবল, যা থাকে কপালে, ঝুঁকিটা নেবে।

খুব সাবধানে এগোল রানা। ইতিমধ্যে রশিটা চাদরের ওপর গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে, হাতে চলে এসেছে ছুরিটা। লোকটাকে মারার কোন ইচ্ছে ওর নেই, প্রাণ রক্ষার জন্যে একান্ত বাধ্য না হলে। কাছাকাছি এসে দেখল, পাহাড় প্রাচীরের দিকে খানিকটা পিছন ফিরে বসে আছে লোকটা, তার পিঠ আর প্রাচীরের মাঝখানে চার-পাঁচ হাত ব্যবধান। লোকটার পিছনে চলে এল রানা। নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, তবে ঠিক সেজন্যে রানার হাসি পেল না। হাসি পেল লোকটার আরাম পাবার আয়োজন লক্ষ করে। একটা বোল্ডারের ওপর বসে আছে সে, পা দুটো সামনে লম্বা করা। আরেকটা বোল্ডারে, মাঝখানটা ভেতর দিকে ডেবে আছে, হেলান দিয়েছে সে। অন্ধকারে দেখে মনে হলো, একটা ইজি-চেয়ারে আরাম করে শুয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তার কোলের ওপর পড়ে থাকা সাবমেশিনগানটা আলগোছে তুলে নিতে পারে রানা।

উপত্যকার মুখ গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। পিছনে একটা চোখ, এগোচ্ছে সাবধানে। সরাসরি সামনেই ওদের কমনরুমের দরজা, দরজার কাছে টহল দিচ্ছে আরেকজন গার্ড। সম্ভবত ঘুম তাড়াবার জন্যেই দরজার সামনে পায়চারি করছে লোকটা। মাটির দেয়াল ঘেঁষে তার কাছ থেকে দূরে সরে আসছে রানা, যাচ্ছে প্রাচীন অ্যারেনার দিকে। কাল বিকেলে ওখানেই কোর্সিনেজের সঙ্গে অসি-যুদ্ধ হবে সোহানার।

চারদিকে ট্রেঞ্চের উঁচু পাড়, আবর্জনার স্তূপ, নুড়ি পাথর ও বালির উঁচু ঢাল, কাজেই আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হলো না। অ্যারেনায় পৌঁছে রানা আন্দাজ করল, দশটার মত বাজে।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর গার্ড দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে উপত্যকার বাইরে বেরিয়ে এল রানা। পাহাড়ী নালায় ফিরল না, আড়াল থেকে নজর রাখল প্রথম গার্ডের ওপর। পালাবদলের সময়টা জানা দরকার ওর।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর ছুটি পেল ঘুম-কাতুরে গার্ড।

ফিরতি পথে খুব একটা কষ্ট হলো না রানার, কারণ এবার অ্যাকুয়েডাকটের ভেতর প্রথমে মাথা ঢোকাতে পেরেছে ও। কমনরুমের গর্তের কাছে এসে দেখল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গর্তের কিনারায় বসে রয়েছে সোহানা, হাতে ধনুক, ছুরি দিয়ে চেঁচে আকৃতিটা নিখুঁত করার চেষ্টা করছে। দাঁড়াল সোহানা, রানার হাত ধরে টানেল থেকে বেরুতে সাহায্য করল। ইতিমধ্যে আশরাফ ও জেনি এগিয়ে এসেছে। সবাই রিপোর্ট শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে বুঝতে পেরে মুচকি হাসল রানা, বলল, 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন। লাভ তো হয়েইছে, বোনাসও পেয়েছি।'

অনেক কষ্টে প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল আশরাফ। জানে, ইচ্ছে না হলে তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না রানা। তবে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, রানার সঙ্গে চাদরটা নেই। সোহানার দেখাদেখি রানার গা থেকে জেনিও ধুলোবালি পরিষ্কার করছে। রানাকে ছোট কামরাটায় নিয়ে গেল সোহানা, স্যান্ড-বাথ করাবে। ধনুকটা এখন জেনির হাতে রয়েছে, কোথায় চাঁচতে হবে বলে গেছে সোহানা।

দশ মিনিট পর জেনিকে নিয়ে ছোট কামরায় চলে এল আশরাফ, ইতিমধ্যে স্যান্ড-বাথ সেরে কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে রানা।

'আমি শোব কিসে?' ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল আশরাফ, কিন্তু কারও দিকে তাকাল না।

'মানে?' অবাক হয়ে মুখ তুলল সোহানা।

'সবার মত আমার বিছানাতেও একটা চাদর ছিল,' সোহানার দিকে ফিরল আশরাফ। 'কিন্তু অনেকক্ষণ হলো সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি আমার বিছানার চাদরটা নিতে পারো,' বলল সোহানা।

'নেয়াটা বড় কথা নয়, প্রশ্ন হলো, আমারটা গেল কোথায়?'

হাত বাড়িয়ে রানার একটা কাঁধ ধরল জেনি। 'আশরাফ বলতে চাইছে, কি ঘটতে যাচ্ছে সব কথা আমাদেরকে বলা হোক। আমিও চাই কাল আসলে ঠিক কি ঘটবে আগে থেকে জেনে রাখি।'

'জেনি,' শান্ত গলায়, স্নেহের সুরে বলল রানা। 'সব কথা তোমাদের না জানাই ভাল। কেন ভাল, এ-কথা তোমরা হয়তো এখন বুঝবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। শুধু বিশ্বাস রাখো, আমি আর সোহানা যা করছি, সবার ভালর জন্যেই করছি। লক্ষ্মী বোন আমার, মন খারাপ করে না।'

অপ্রত্যাশিতভাবে 'লক্ষ্মী বোন' বলে আদর করায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটল জেনির চেহারায়। আনন্দে পানি এসে গেল তার চোখে। 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম, আমি আর কিছু জানতে চাইব না,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে।

'আমিও বিশ্বাস করব, আর কিছু জানতে চাইব না,' গোঁ ধরার সুরে বলল আশরাফ। 'সোহানা যদি আমাকে লক্ষ্মী ভাই বলে!'

একযোগে হেসে উঠল সবাই, পরমুহূর্তে ঠোঁটে আঙুল রেখে শশশ আওয়াজ করল রানা। 'চুপ, চুপ! বাইরে আওয়াজ গেলে ওরা দেখতে আসবে কি ঘটছে এখানে। চলো, পাথরের ফলকগুলো জায়গামত বসিয়ে দিয়ে আসি।'

'আমার শুধু একটা কথা ভেবে খারাপ লাগছে,' ওদের সঙ্গে ছোট কামরাটা থেকে বেরুবার সময় রানাকে বলল জেনি। 'সবাই যে যার সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করছে, একা শুধু আমিই কোন কাজে লাগছি না। নিজেকে আমার গুড ফর নাথিং বলে মনে হচ্ছে।'

'কাজে লাগছ না? অ্যাকুয়েডাকটা কে আবিষ্কার করল, আমি?' জানতে চাইল রানা। 'গুড ফর নাথিং অনেক পাব আমরা, এরপর তাদেরকে সাহায্য করবে তুমি। আপাতত তোমার কাজ হলো, আশরাফের দিকে লক্ষ্য রাখা,' শেষ কথাটা নিচু গলায় বলল রানা। 'সোহানার জন্যে খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে সে। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি ওর গায়ে খানিকটা হেলান দাও—আক্ষরিক অর্থে বলছি না।'

'বুঝেছি কি চাও। সারাক্ষণ ওকে ব্যস্ত রাখব, তাই তো?'

'আমি চাই না কালকের ঘটনাটা নিয়ে বেশি চিন্তা করুক সে।'

কোর্সিনেজের ঘামের গন্ধটা মনে পড়ে গেল জেনির, শুনতে পেল তার তলোয়ারটা বাতাসে শিস কাটছে। 'আমি নিজেও তো চিন্তা করতে চাইছি না,' শুকনো গলায় বলল সে।

সকাল থেকে শুরু হলো প্রখর রোদ আর চাপা উত্তেজনা। উপত্যকার প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন কি এক অজানা আশঙ্কায় অধীর হয়ে আছে। ব্রুনেলের মুখে হাসি ধরে না, শ্রমিকদের দুটো দলের মাঝখানে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে সে, বাতাসে উড়ছে তার দোমড়ানো-মোচড়ানো জ্যাকেট। আগের মতই চুপচাপ রয়েছে পেনিফিদার, তবে চোখে ঠাণ্ডা একটা সন্তুষ্টির ভাব। আর পাইথনের চেহারায় অলস পরিতৃপ্তি, যেন পঙ্গু একটা ইঁদুরকে নিয়ে খেলছে শিকারী বিড়াল।

রানা ও সোহানা দল বদল করেছে, সোহানাকে কোর্সিনেজের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্যে। ব্রেন-ওয়াশ-এর শিকার আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যরা সবাই খুব নার্ভাস। আলজিরিয়ান গার্ডরা একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক, পরিবেশ থেকে একঘেয়ে ভাবটা দূর হতে যাচ্ছে বলে খানিকটা রোমাঞ্চিতও।

আশরাফকে পাইথনের সান্নিধ্যে মাত্র ঘণ্টাখানেক ভুগতে হলো, তারপর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো শ্রমিকদের একটা দলে, যাদের ওপর নজর রাখছে কোর্সিনেজ। আজকের জন্যে বরাদ্দ করা জায়গায় কাজ শুরু করল জেনি। জমিনের ওপর আজ সে লম্বালম্বিভাবে হাঁটছে না, হাঁটছে আড়াআড়িভাবে। ব্যাপারটা যদি লক্ষও করে থাকে পাইথন, কোন আপত্তি জানায়নি। এটাকেও একটা বোনাস বলা যেতে পারে। এর মানে হলো, দিনের শেষদিকে বাজারের কোনটায় পৌঁছুবে সে।

তারপর দুপুরের কর্মবিরতি শুরু হলো।

শুধু ঘুমোবার সময়টা ছাড়া ছোট কামরাটায় এখন আর দেখা যায় না মিসেস হোয়াইটস্টোনকে, ফলে ওটা শুধু ওরা চারজনই ব্যবহার করছে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে মন নেই, ভেতরে ঢুকেই একটা ছুরিতে শান দিতে বসল আশরাফ। রানা বসল দুটো তীর নিয়ে।

জেনি বসেছে আশরাফের পাশে, একটা জ্যাকেট থেকে লম্বা লিনেন-এর সুতো

বের করে পাকাচ্ছে সে। জ্যাকেটটা আর্কিওলজিকাল টীমের এক সদস্যের কাছ থেকে চুরি করে এনে দিয়েছে আশরাফ। ধনুকের ছিলা হিসেবে নাইলন ব্যবহার করতে রাজি নয় রানা, কারণ টান পড়লে ওটা তত বেশি বাড়ে না। সবচেয়ে ভাল হত শণ পেলে। তার বদলে লিনেন দিয়ে কাজ চালানো হবে।

নিজের বিছানায় পদ্মাসনে বসে রয়েছে সোহানা। দেখে মনে হলো ঘুমাচ্ছে, যদিও চোখ দুটো খোলা, পাতাগুলো নড়ছে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ এত মন্থর যে বুকের ওঠা-নামা ধরা পড়ছে না চোখে।

সোহানার শারীরিক উপস্থিতি ও সচেতনতার অভাব প্রথমদিকে খানিকটা গা ছমছমে ভাব এনে দিয়েছিল আশরাফের মনে। তবে দশ মিনিট পর ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। সোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে সে লক্ষ করল, ওর চেহারায় ধীরে ধীরে আশ্চর্য এক প্রশান্তি ফুটে উঠছে। সমস্ত চাপ ও উত্তেজনা, বোঝা ও উদ্বেগ মুক্ত হয়ে ওর মনটা যে পরিচ্ছন্ন ও হালকা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল সে। সোহানাকে কেউ বিরক্ত করছে না। কাজ করার সময় এটা-সেটা নিয়ে হালকা সুরে কথা বলছে রানা, পরিবেশটা যাতে স্বাভাবিক থাকে।

এক ঘণ্টা পর বড় করে শ্বাস নিল সোহানা, নড়ে উঠল শরীরটা। খোলা চোখে এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরে এল। আড়মোড়া ভাঙল ও, হাই তুলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

'কানে এল, তুমি নাকি নিজেকে কোন কম্মের নয় বলে মনে করছ, জেনি,' বলল ও। 'এসো, তোমার জাদুর কাঠিগুলো এবার কাজে লাগাও।'

'জাদুর কাঠি, সোহানা?' অবাক হয়ে সোহানার দিকে মুখ ফেরাল জেনি।

'তোমার আঙুল,' বলল সোহানা। 'আমার কাঁধ আর পিঠের পেশীগুলো ডলে দাও।'

আধ ঘণ্টা পর জেনিকে নিজের কাজে ফেরত পাঠাল সোহানা, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার তীরগুলোর খবর কি, রানা?'

'ভেইনগুলোয় আঠা লাগাব এখন,' বলল রানা। 'সন্ধের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

কাল ভোর রাতের দিকে দুঃস্বপ্ন ঠাসা ঘুম ভাঙার পর আশরাফ দেখেছে, পাথর আর লোহা ঘষে ছোট্ট একটা আগুন তৈরি করছে রানা। সেই আগুনে ট্রেঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা প্রাচীন জীব-জন্তুর হাড়ের খুদে টুকরো আধ মগ পানিতে ফোটাতে শুরু করে ও। এখন, বারো ঘণ্টা পর, মগের নিচে পাতলা আঠার একটা প্রলেপ পড়েছে। রানার সামনে এই মুহূর্তে শুকনো খানিকটা উল দেখা যাচ্ছে। একটা পাথরের গায়ে লোহা ঘষে আগুন জ্বালার চেষ্টা করছে ও।

'ওই হাড় থেকে তুমি আঠা পাবে, আমার বিশ্বাস হয়নি,' বলল আশরাফ। 'অনেক কালের পুরানো, শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে গেছে।'

'পুরানো হলে শুধু চর্বি থাকে না,' বলল রানা। 'আমার জন্যে ভালই হয়েছে, চর্বিটুকু তো ফেলেই দিতে হত।' মগের ভেতর কয়েক ফোঁটা পানি ঢালল ও, তারপর আগুনের ওপর কয়েকটা শুকনো ডাল রাখল।

তীরগুলোয় ভেইন লাগাবার পর দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর অ্যাকুয়েডাকটের মুখের কাছে চলে এল। টানেলের ভেতর অন্যান্য হাতিয়ারের সঙ্গে তীরগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার, মিসেস হোয়াইটস্টোনের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল, 'একটা মজার গল্প বলি শোনো।'

মধ্যাহ্ন বিরতির বাকি সময়টা হাসাহাসি করে কাটাল ওরা।

বিকেল যতই গড়াল, ততই বাড়ল উত্তেজনা। ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে বাজার এলাকায় শোরগোল শোনা গেল। কাছাকাছি শ্রমিকদলটার সঙ্গে কাজ করছে সোহানা, দেখল জেনিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে পেনিফিদার, ব্রুনেল ও পাইথন। ছুটে আসছে কোর্সিনেজও। পাইথন আর পেনিফিদারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, কিছু কিছু কথা শুনতেও পেল সোহানা। গলা ছেড়ে হাসছে দানবটা। রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে পেনিফিদার।

'...ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালার ব্যবস্থা করলে আজ রাতেই আমরা মাটি খুঁড়তে পারি! তুমি আপত্তি করছ কেন?'

'...মুখ হাঁ করে থাকার স্বভাবটা তোমার গেল না, পেনিফিদার। না-না! আমরা শুরু করব কাল,' হাসির ফাঁকে বলল পাইথন।

অবশেষে আড়ষ্টভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পেনিফিদার। সোহানা দেখল, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল পাইথন, তার গলা এবার পরিষ্কার শুনতে পেল ও। 'তাছাড়া, মেজর কোর্সিনেজকে তার প্রাপ্য আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত করতে পারি না, পারি কি? নিজেকেও আমি বঞ্চিত করতে রাজি নই।'

সোহানার দিকে এগিয়ে এল পাইথন, তার লম্বা হাত দুটো দুলছে, থামল একবারে ওর মুখের সামনে এসে। 'আজ তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, মনে আছে তো? আমাদের মেজর কোর্সিনেজ তোমার চারপাশে তলোয়ার নাড়বে। শুধুই বাতাসে কিনা, একটু পরই আমরা তা জানতে পারব, তাই না?'

সাত

ছোট্ট, গোলাকার অ্যারেনার বালি এখনও গরম হয়ে রয়েছে। সোহানার বাম দিকে, পাথরের নিচু একটা মঞ্চে বসে রয়েছে দৈত্যাকৃতি পাইথন, তার পাশে পেনিফিদারকে নিতান্তই খুদে ও নগণ্য দেখাচ্ছে। পেনিফিদারের রাগ ইতিমধ্যে পানি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে।

ওর ডানে, অ্যারেনার উল্টোদিকে, দু'সারি আসনে বসানো হয়েছে বন্দীদের। রানা বসেছে নিচের সারিতে, পা নেমে এসেছে অ্যারেনার বালিতে। রানা ও আশরাফের মাঝখানে বসে আছে জেনি। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর দল বসেছে ওপরের সারিতে। তারা কেউ কথা বলছে না, এমন কি নড়াচড়াও করছে

না। কি ঘটতে চলেছে ওরা কেউ তা জানে কিনা বলা কঠিন।

ভাঙাচোরা আসন সারির ওপর দিকে রয়েছে আলজিরিয়ান গার্ডরা। কয়েকজন বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, হাতের সাবমেশিনগান কক করা।

প্রাচীন মাসে কখনও মল্লযুদ্ধ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। ছোট্ট, পাঁচমেশালি একটা জনগোষ্ঠী নির্ভেজাল রোমান সার্কাস পছন্দ করত বলে মনে হয় না। অ্যারেনাটা সম্ভবত খেলাধুলোর কাজে ব্যবহার করা হত—দৌড়, ককফাইট, ট্রেনিং ও মক কমব্যাট। অদ্ভুতই বলতে হবে, ও আর কোর্সিনেজ এই প্রথম ও শেষবারের মত ডেথ-ডুয়েল লড়ছে এখানে।

হাতে তলোয়ার, অ্যারেনার উল্টোদিকে উদয় হলো ব্রুনেল। ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিল সোহানা। প্রথমে বুট জোড়া খুলে ফেলল পা থেকে। খালি পায়ে লড়তে চায় ও, কারণ আলগা বালির ওপর বুট পিছলে যেতে পারে। ও জানে, বালির নিচে রয়েছে কঠিন মাটি। এরপর গায়ের কালো চাদরটা সরাল। চাদরের নিচে পা ও উরু সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল ওর, পরে আছে ছোট্ট একটা শর্টস। গায়েও শুধু একটা ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের চেয়ে সামান্য একটু বড়। দেখে মনে হতে পারে আধুনিক কোন ফ্যাশন শো চলছে, সোহানা এসেছে মূলত দেহ প্রদর্শনের জন্যে। এতটা খোলামেলা হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রুনেল, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল দু'এক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'তারমানে কি লোভনীয় টার্গেটগুলো অফার করছ তুমি ওকে?'

সোহানা জবাব দিল না।

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল আবার ব্রুনেল। 'তুমি দেখছি কোর্সিনেজের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।'

ঠাণ্ডা সুরে সোহানা বলল, 'আমি চাই না ক্ষতের ভেতর কাপড় বা সুতো ঢুকে পড়ুক।' অজুহাত হিসেবে শুনতে ভালই লাগল। ডুয়েলিং-এর প্রাচীন যুগে ক্ষতের ভেতর নোংরা কাপড় ঢুকে যাওয়ায় অনেক যোদ্ধা সংক্রমণের শিকার হয়ে মারা গেছে, সেজন্যেই সার্জেনরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরামর্শ দিত কোমর পর্যন্ত উদোম হয়ে লড়াই করার।

অশ্লীল ও দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল ব্রুনেল, তারপর বলল, 'হোলি গড! তুমি কি ধরে নিয়েছ প্রথমবার একটু রক্ত দেখা গেলেই ব্যাপারটার ইতি ঘটবে? কোর্সিনেজ তোমাকে ঝাঁঝরা করে ছাড়বে, সুন্দরী।'

সোহানা দেখল, ওর শরীরের ওপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ব্রুনেল। আগেই ব্রুনেলকে যৌন বিষয়ে অপরিণত স্কুলছাত্র বলে সন্দেহ হয়েছিল ওর, এখন তার আচরণ দেখে নিশ্চিত হলো। ওর গায়ে হাত দেয়ার, ওকে ছুঁয়ে দেখার ব্যাকুলতা থেকে বোঝা যায়, গির্জায় তাকে শেখানো হয়েছে নারীদেহ নিষিদ্ধ ও অপবিত্র বস্তু, কৈশোর ও যৌবনের শুরুটা কেটেছে কঠিন শাসনের বেড়াজালের ভেতর—সম্ভবত।

তলোয়ারটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ব্রুনেল, হাতলটা মুঠোর ভেতর রেখেছে যাতে ফলার দিকটা ধরতে বাধ্য হয় সোহানা, তারপর দ্রুত পিছিয়ে ওর নাগালের বাইরে চলে গেল। অত্যন্ত সতর্ক লোক সে। আগ্নেয়াস্ত্র তাক করা না থাকলে রানা বা সোহানার কাছাকাছি আসে না কখনও, অন্তত পাঁচ ফুট দূরে থাকে সব সময়। 'দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এক অর্থে ভারি লোভনীয় মাংসের অপচয় ঘটতে যাচ্ছে। সত্যি, খাসা একটা মাল। সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমি পাচ্ছি না, আর কেউও পাচ্ছে না। কাজেই তোমার বিদায়পর্বটা সবার মত আমিও উপভোগ করব, সুন্দরী।' ব্রুনেলের হাসিটা আকস্মিক আক্রোশে ভরে উঠল, পেনিফিদার ও পাইথনের কাছে ফেরার জন্যে মঞ্চের দিকে ঘুরল সে।

তলোয়ারের হাতলটা মেরুদণ্ডের মত গিঁটবহুল, পিস্তল গ্রিপ ধরার ভঙ্গিতে আঙুলগুলো মোড়া যায়। ব্যালেন্স পরীক্ষা করার জন্যে বাতাসে সপাং সপাং আওয়াজ তুলল বার কয়েক, চোখের পলকে তলোয়ারটা জ্যান্ত হয়ে উঠল ঠিক যেন ওর হাতের বাড়তি একটা অংশের মত।

তীক্ষ্ণমুখ ডগাটা হালকাভাবে বালিতে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে সোহানা। চেহারা সম্পূর্ণ শান্ত ও ভাবলেশহীন। চিন্তা করার কিছু নেই ওর। কাজে লাগুক বা না লাগুক, রণকৌশল ওর এরইমধ্যে ঠিক করা হয়ে গেছে। কোর্সিনেজের রণকৌশল কি হবে সেটার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

কোর্সিনেজ মিথ্যে গর্ব করে না, অবশ্যই অত্যন্ত ভাল একজন সোর্ডসম্যান সে। তার হাত লম্বা, কাজেই সহজে নাগাল পাবার একটা সুবিধে ভোগ করবে। দেখার বিষয় হলো, পাইথনের নির্দেশ অমান্য করে ইস্পাতের জ্যাকেট ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে সে আসবে কিনা। নিজেকে নিয়ে যদি যথেষ্ট গর্ব থাকে, তাহলে জ্যাকেটটা পরবে না। এতটা আশা করা উচিত হচ্ছে না, নিজেকে সাবধান করে দিল সোহানা। নীচ, স্থূল ও বিবেকবর্জিত একদল অপরাধী ওরা, অন্যায় সুযোগ নিতেই অভ্যস্ত।

সোহানার রয়েছে দুটো সুবিধে। একটা হলো, প্রথম কয়েকটা এনগেজমেন্টে কোর্সিনেজ ওকে খুন করার চেষ্টা করবে না। ডুয়েলে তলোয়ার দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পুরো ব্যাপারটা তার ভেতর উন্মত্ত একটা ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করতে চাইবে সে। ধীরে-সুস্থে তার জানা সমস্ত নৈপুণ্য ও কৌশল ব্যবহার করবে। ছোট ছোট আঘাতের মাধ্যমে রক্তাক্ত করবে প্রতিপক্ষকে, দুর্বল করবে। শেষ আঘাতটা হানবে একেবারে শেষ দিকে। কোর্সিনেজের জন্যে ব্যাপারটা হবে প্রলম্বিত সঙ্গমের মত, যার সর্বশেষ পরিণতি চরম পুলক।

কাজেই হাতে সময় পাবে সোহানা, যে সময়টা দ্বিতীয় সুবিধে ভোগ করার সুযোগ এনে দেবে ওকে। কোর্সিনেজ নিশ্চয়ই ফেনসিংকে একটা শিল্প মাধ্যম বলে গণ্য করে সারা জীবন নিয়ম ধরে চর্চা করেছে, নিয়মের বাইরে না যাবার প্রবণতা তার ভেতর থাকাটা স্বাভাবিক। এলোপাতাড়ি ও বিশৃঙ্খলভাবে তলোয়ার চালাতে দেখলে খেপে যাবে সে।

সোহানা নিয়মের খুব একটা ধার ধারবে না, সুযোগ পেলে সেটা নিজের

সুবিধেমত সদ্ব্যবহার করবে। অবশ্য এটা উপলব্ধি করতে খুব বেশি সময় নেবে না কোর্সিনেজ, ফলে নিয়মবহির্ভূত কৌশলের জন্যে তৈরি থাকবে সে। তবে যতই সতর্ক হোক, খানিকটা অস্বস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

ক্রুনেলের আওয়াজটা শুনতে পেল সোহানা। 'আহ্।'

মাথা ভাঙা পাথরের স্তম্ভগুলোর মাঝখান দিয়ে বীরদর্পে হেঁটে আসছে কোর্সিনেজ। এককালে অ্যারেনার প্রবেশপথে স্তম্ভগুলো খিলানের কাঠামো তৈরি করেছিল। সাদা ব্রীচ, ফেনসিং শু ও ইস্পাতের জাল দিয়ে তৈরি মেশ জ্যাকেট পরে আছে সে। জ্যাকেটটা তার উরু পর্যন্ত নেমে এসেছে। হাতে সোহানার মতই একটা তলোয়ার। পাথুরে আসন থেকে ফিসফিস করল জেনি, 'কি ঘটছে?' হাতড়াল সে, রানার হাতটা পেয়ে আঁকড়ে ধরল।

'কোর্সিনেজ,' বলল রানা, ঠোঁট প্রায় নড়লই না। 'যে-কোন মুহূর্তে শুরু হবে এবার। কথা বলো না, জেনি।'

জেনির অপরপাশে বসে রয়েছে আশরাফ, অ্যারেনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এক সেকেন্ডের জন্যে তার দিকে তাকাল সে। উত্তেজনায় ও উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। কথা বলতে পারল না আশরাফ, তার শরীরের প্রতিটি নার্ভ লাফাচ্ছে। রক্তশূন্য ও অসুস্থ বোধ করছে সে। মুহূর্তের জন্যে জেনি অন্ধ বলে ঈর্ষা হলো তার। এখন যা ঘটবে তা দেখতে না হলেই ভাল হত, কারণ নরকযন্ত্রণার চেয়ে কম নয় ব্যাপারটা। অথচ চোখ ফিরিয়ে রাখাও অসম্ভব। বোধহয় সেজন্যেই জেনির জন্যে ব্যাপারটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর—সমস্ত শব্দ তার কানে ঢুকবে, অনুভব করবে উত্তেজনাটুকু, তার আশপাশে দর্শকরা দম বন্ধ করলে আওয়াজ পাবে সে, কাঁদলে শুনতে পাবে, অথচ কিছুই দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না ঠিক কি ঘটছে। তবে কল্পনা করতে পারবে। কিন্তু মানুষ সাধারণত খারাপটাই আগে কল্পনা করে। কি ঘটতে পারে কল্পনা করার চেষ্টা করল আশরাফ। সঙ্গে সঙ্গে বমি পেল তার।

আবার সোহানার দিকে তাকাল আশরাফ। শারীরিক কাঠামোর কিনারা অ্যাথলেট-এর মত দৃঢ়, নিরেট ও সুন্দর। ওর বুক টান টান হয়ে আছে, উঁচু ভাবটুকু প্রকট নয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠা-নামাও চোখে প্রায় ধরা পড়ছে না। ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে অ্যারেনার মাঝখানে চলে আসছে ও।

স্থির একটা মূর্তির মত বসে রয়েছে রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে, পা দুটো লম্বা করে দিয়েছে অ্যারেনার বালির ওপর, একটা হাত দুই উরুর মাঝখানে কব্জি পর্যন্ত ঢোকানো, অপর হাত ধরে আছে জেনির কব্জি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও, তাকিয়ে আছে সোহানার দিকে। চেহারায় কোন ভাবাবেগ নেই।

অ্যারেনায় পৌঁছুল কোর্সিনেজ, সোহানার কাছ থেকে দশ ফুট দূরে দাঁড়াল। তারপর মঞ্চের দিকে ঘুরল সে, স্যালুটের ভঙ্গিতে নাকের সামনে খাড়া করল তরোয়াল, ভঙ্গিটা না বদলে আবার ঘুরে মুখোমুখি হলো সোহানার। সোহানার শরীরে কাপড়ের অভাব তাকে যদি বিস্মিত করে থাকে, চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না।

শান্তস্বরে, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে সোহানা বলল, 'লাভলি স্টাইল। এবার চেষ্টা করো ওটা বুকে গেঁথে আত্মহত্যা করতে পারো কিনা। একটা মেয়ের হাতে মারা যাবার চেয়ে ভাল হবে সেটা।'

খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল পেনিফিদার। হাসির দমকে ঝাঁকি খেল পাইথন।

প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়ল আশরাফ, পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল, কথাটা হিসেব করেই বলেছে সোহানা। অপমানটা করা হয়েছে তলোয়ারটাকে, কোর্সিনেজকে নয়। প্রতিপক্ষকে খেপিয়ে তুলে দিশেহারা করার চেষ্টা।

জ্যান্ত প্রাণীর মত কিলবিল করে উঠল কোর্সিনেজের মুখের পেশী। কথা বলল না, ধীরে ধীরে ভাঁজগুলো অদৃশ্য হলো মুখ থেকে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সোহানার শরীরের ওপর চোখ বুলাল সে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে, অপারেশন শুরু করার আগে একজন সার্জেন যেন দেখে নিচ্ছে কোথায় ছুরি চালাবে।

ভরাট গলা শোনা গেল পাইথনের, 'আমাদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না, প্লীজ।'

ফলা খাড়া করল কোর্সিনেজ, নিচু হয়ে অন-গার্ড পজিশনে আনল শরীরটাকে। দেখাদেখি সোহানাও। দুটো তরোয়াল এক হয়ে একটা ক্রসচিহ্ন তৈরি করল।

ফেনসিং-এ প্রথমবার দুটো ফলা এক হলে শক্তি বা সচেতনতার একটা প্রবাহ বয়ে যায় প্রতিপক্ষদের শরীরে, ইলেকট্রিক কারেন্টের মত। নরম ও এক পলকের প্রথম এনগেজমেন্টেই বুঝতে পারল সোহানা, এমন একজন ফেনসিং মাস্টারের মুখোমুখি হয়েছে সে, যার দক্ষতা প্রশ্নাতীত, সমস্ত কৌশলই যার শেখা আছে।

তারপর আর চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল না। এমন প্রচণ্ড শক্তি ও দ্রুতবেগে আক্রমণ করল কোর্সিনেজ যে ঠেকাবার পর আর পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পেল না সোহানা। ঠেকাচ্ছে সোহানা যথাসম্ভব কম শক্তি ব্যয় করে, যতটুকু সম্ভব তলোয়ারটাকে কম ঘুরিয়ে। এ-ছাড়া কোন উপায়ও নেই ওর, কারণ ওর তলোয়ারের ওপর কোর্সিনেজের আঘাত, এনগেজমেন্ট ও রিডাবলস এমন চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একের পর এক আসছে যে প্রতিমুহূর্তে পিছু হটতে হলো, শুধুই ঠেকাচ্ছে, চেষ্টা করছে দুই তলোয়ারের মাঝখানে যতটা সম্ভব বেশি ব্যবধান রাখতে।

পিছু হটতে হটতে এরইমধ্যে সীমার বাইরে চলে এসেছে সোহানা। এখানে নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই বটে, কিন্তু গোলাকার অ্যারেনার শেষ মাথায় আসনের সারিটা নিচু দেয়ালের মত—সোহানা বুঝতে পারল, দেয়ালটার কাছাকাছি চলে এসেছে ও। কোর্সিনেজের বেপরোয়া আক্রমণের মুখে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল এবার।

লাঞ্জ, রিপ্রাইজ, রিডাবলমেন্ট, রিকভারি—কোর্সিনেজের রিকভার বিস্ময়কর, স্যাঁৎ করে পিছিয়ে অন-গার্ড পজিশনে চলে আসে, যেন কোন চেষ্টা ছাড়াই, যেন একটা স্প্রিঙ টেনে নিচ্ছে তাকে। আবার পিছু হটতে বাধ্য হলো সোহানা, অকস্মাৎ দুই পা এক করে সামনের দিকে লাফ দিয়েছে কোর্সিনেজ। পরমুহূর্তে যে

আক্রমণটা এল, মনে হলো কোর্সিনেজের শরীর, বাহু ও ফলা সমস্ত সম্ভাবনার মাত্রা ছাড়িয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে।

নিজেকে কোর্সিনেজের নাগালের বাইরে বলে মনে করেছিল সোহানা, ফলে ঠেকাতে এক পলক দেরি হয়ে গেল ওর, তরোয়ালের ধারালো ডগা ওর উরুর বাইরের দিকটা ছিঁড়ে দিল। ভারসাম্য ফিরে পেল কোর্সিনেজ, পিছু হটে নাগালের বাইরে চলে গেল। সোহানার উরুতে লাল রেখাটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, দেখল সে, হেসে উঠল শব্দ করে, তারপর পিছন ফিরল, হেঁটে আরও দূরে সরে আসছে, কাঁধের ওপর দিয়ে লক্ষ রাখছে সোহানার ওপর।

আহত পা-টা কয়েকবার ভাঁজ করল সোহানা, পেশীর কোন ক্ষতি হয়নি। ঘামে সারা শরীর চকচক করছে, হেঁটে ফিরে এল অ্যারেনার মাঝখানে, ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে প্রতিপক্ষ। নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়নি ও। অসি-যুদ্ধে বেশিরভাগ আঘাত আসে বাহুর ওপর, তলোয়ার ধরা হাতের ওপর। কোর্সিনেজের লক্ষ্যও ছিল ওই হাতটাকে জখম করা। কিন্তু তাকে অন্তত সোহানা বাধ্য করেছে প্রথম রক্ত অন্য কোথাও ঝরাতে। ছোট্ট হলেও, খুশির আরও একটা খবর আছে। আক্রমণটার উদ্দেশ্য ছিল পেশী ভেদ করা, কিন্তু সোহানার উরুতে শুধু একটা আঁচড় কাটতে পেরেছে প্রতিপক্ষ।

আরও একটা ব্যাপার হলো, দর্শকদের মুগ্ধ করার ও সেই সঙ্গে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে কোর্সিনেজ তার বাহুবল, গতি ও কৌশল প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। আক্রমণে সফল হবার জন্যে দ্রুতগতি খুবই দরকার, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী একটা লড়াইয়ে দ্রুতগতি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বিশেষ করে কোর্সিনেজ যে গতিতে আক্রমণ করছে, কোন মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ এই গতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়, লড়াইটা যদি নিয়ম-বাঁধা পদ্ধতিতে চলতে থাকে, সোহানাকে নির্ঘাত খুন করবে সে। বর্তমান পদ্ধতিটা আরও কিছুক্ষণ চালু রাখা দরকার, সোহানা চাইছে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতভাবে বুঝুক এই পদ্ধতিতেই খেলা চলবে। ওর কাজ হলো, মধ্যবর্তী এই সময়টা বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।

পজিশন নিল সোহানা, আবার এনগেজ হলো তলোয়ার। এবার নিজের তলোয়ার বৃত্তাকারে ঘোরাতে শুরু করল কোর্সিনেজ। এ তার আক্রমণ করার ডান মাত্র, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্ররোচিত করতে চাইছে সোহানাকে, ওর ফলাটা যাতে নাগালের মধ্যে পায়, পেলেই আঘাত হেনে হাত থেকে ওটাকে খসাবার চেষ্টা করবে। তবে এবার গতি খানিকটা মন্থর হওয়ায় শুধু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর না করে কমব্যাট ব্রেনটাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেল সোহানা।

প্রতিপক্ষের ফলার সঙ্গে সাবধানে খেলল সোহানা, প্রতি মুহূর্তে ওটার গতিবিধি লক্ষ করছে, মাপ রাখছে ক্ষিপ্রতার, চিহ্নিত করছে আক্রমণের হুমকিগুলো, একবারও নাগালের মধ্যে যাচ্ছে না। কৌশলটায় কাজ হচ্ছে না দেখে ঘন ঘন আঘাত হানতে শুরু করল কোর্সিনেজ, নিজের দৈহিক শক্তির সুবিধেটুকু কাজে লাগিয়ে সোহানাকে ক্লান্ত করতে চাইছে। হাত ও ফলা এমন একটা লাইনে রাখল সোহানা, ওর তরোয়ালের শুধু ডগার দিকটা নাগালের মধ্যে পেল

কোর্সিনেজ, ফলে জুতসই কোন আঘাতই করতে পারল না সে।

এই পর্বে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল সোহানা। সবচেয়ে বড় লাভ, কোর্সিনেজের বিশেষ ছন্দটি ধরে ফেলেছে ও। ঘন ঘন আক্রমণের সময় তার গতি ও ক্ষিপ্রতা কখন কতটুকু কমে-বাড়ে, জানা হয়ে গেছে।

চওড়া পাথুরে আসনে বসে প্রথম পর্বের লড়াই দেখার সময় অসুস্থবোধ করছিল আশরাফ, আরেকটু হলে বমি করে ফেলত। এই মুহূর্তে প্রায় নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে, ঘামে ভিজে গেছে মুখটা। খামচে ধরা বাহুতে ঢুকে গেছে নখগুলো।

ফলার সংঘর্ষে আওয়াজ হচ্ছে, সেগুলো শুনে মনে মনে ছবি আঁকছে জেনি, পরমুহূর্তে ছবিগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। ফলার আওয়াজ কান থেকে বের করে দিলে শুনতে পায় আশরাফের গোঙানি, কিংবা রানার নিঃশ্বাস-পরিবর্তনের শব্দ। রানার শক্ত মুঠোয় ব্যথা করছে তার হাত, রানা প্রায় ভেঙে ফেলছে ওটাকে। তবু কিছু বলছে না জেনি। মন থেকে ছবিগুলো মুছে ফেলার জন্যে সাহায্য করছে ব্যথাটা।

সেই একই ভঙ্গিতে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে বসে আছে রানা, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এক চুল নড়েনি, নড়েনি চোখের পাতা বা মুখের একটা পেশী। তবে এখন ওর চোখে উত্তেজনার চকচকে একটু ভাব ফুটে রয়েছে। প্রথম দিকে ক্ষিপ্র হামলাগুলো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ওকে, তবে সে পর্বটা শেষ হয়েছে। লড়াই যত দীর্ঘ হবে, ততই বাড়বে সোহানার সুযোগ। হতে পারে কোর্সিনেজ দুনিয়ার অন্যতম সেরা ফেনসার, কিন্তু ফেনসিং কমব্যাট-এর একটা ধরন মাত্র। কমব্যাটে সবচেয়ে যেটা জরুরী, শত্রুকে চিনতে পারা। রানা জানে, দু'মিনিটে কোর্সিনেজকে যতটুকু চিনতে পারবে সোহানা, সোহানাকে ততটুকু চিনতে কোর্সিনেজের লাগবে দু'হপ্তা।

আবার আক্রমণ করল কোর্সিনেজ, এবার ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁতভাবে। পিছু হটল সোহানা, তবে এবার জায়গা ছাড়ছে থেমে থেমে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে। ঠেকানোর পরপর পাল্টা আঘাত খুবই কম করল, যা-ও বা করল তা শুধু এক্সপেরিমেন্টের জন্যে, ঠিক ক্ষতি করার জন্যে নয়। নিজে অরক্ষিত, কাজেই দ্রুত ছুটে গিয়ে হামলা করাটা হবে পাগলামি, বিশেষ করে ওর একমাত্র টার্গেট যখন কোর্সিনেজের মাথা ও বাহু।

পরের পর্বটা দীর্ঘ ও দর্শনীয় হলো, কোর্সিনেজের প্রতিটি আঘাত সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সাড়া দিল সোহানা, উৎসাহিত করতে চাইছে, জানে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে পেরে গর্ববোধ করছে প্রতিপক্ষ। দু'বার তার ডগা টার্গেটে স্পর্শ করল। অবশেষে সোহানা যখন লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে চলে এল, দেখা গেল ওর ডান স্তনের ওপরে লাল একটা ফুল ফুটেছে, আর কুৎসিত একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, পাঁজর বরাবর।

চোখ সরু করে সোহানাকে এক মুহূর্ত দেখল কোর্সিনেজ, কর্কশ চেহারায় আক্রোশ মেশানো ক্ষীণ শ্রদ্ধার ভাব। তারপর অন-গার্ড পজিশনে চলে এল সে,

আচরণে আশ্চর্য একটা কর্তৃত্বের ভাব।

তরোয়াল এনগেজ করল সোহানা, এবং এই প্রথম আক্রমণে গেল। সামান্য বিস্মিত হলো কোর্সিনেজ। সোহানা চেষ্টা করল তার ফলাটাকে ঢেকে ফেলতে। কোর্সিনেজের আঙুল ও কব্জির প্রচণ্ড শক্তির কথা মনে রাখলে, কৌশল হিসেবে এটাকে ভাল বলা চলে না, তবে সব ধরনের কমব্যাট মুভমেন্টে চরম মুহূর্ত বলে একটা ব্যাপার থাকে, যখন মন মাথা পেশী ও লক্ষ্য এক হওয়ার জন্যে অদম্য হয়ে ওঠে।

অল্প পরিসরে ঘুরন্ত সোহানার তরোয়ালের ওপরের অংশ আঘাত হানল, আঘাত হানল প্রতিপক্ষ অস্ত্রের সবচেয়ে দুর্বল অংশে, ডগা থেকে খানিক ওপরে। নিজের অস্ত্র দিয়ে কোর্সিনেজের অস্ত্র আটকে ফেলল সোহানা, আটকে নিয়ে টান দিল, ঝাপটা খেয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেল তলোয়ারটার ডগা। কোর্সিনেজের প্রতিক্রিয়া হলো প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ, কারণ সেটা নিয়মের বাইরে। তবে যথেষ্ট দ্রুতই হলো প্রতিক্রিয়া। এখন পিছু হটলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে সে, ফলে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে না সোহানা। তার বদলে সামনে বাড়ল সে, দুটো শরীর প্রায় এক হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকল ওরা, দুটো মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান, হাতলের মাথায় সেঁটে আছে দুটো ফলা, খাড়াভাবে ওপর দিকে তাক করা। ঠিক এই সময় একটা হাঁটু ভাঁজ করে ওপরে তুলল সোহানা, সমস্ত শক্তি দিয়ে গুঁতো মারল কোর্সিনেজের দুই উরুর সন্ধিতে।

ওর একটা সন্দেহ সত্যি কিনা দেখতে চেয়েছিল সোহানা। আঘাতটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, তলপেটের নিচেটা সুরক্ষিত করার জন্যে একটা কিছু পরে আছে কোর্সিনেজ, সম্ভবত তেকোনা বাক্স আকৃতির একটা কিছু, প্লাস্টিকের তৈরি। ভাঁজ করা হাঁটু ভেতরে ঢুকে গেল, সোহানা অনুভব করল ভেঙে গেল জিনিসটা। তবু খুশি হতে পারল না ও, আঘাতটা গুরুতর হয়নি।

হাঁপিয়ে উঠল কোর্সিনেজ, সমস্ত শক্তি দিয়ে সরিয়ে দিল সোহানাকে, কোমর বাঁকা করে নিচু করল শরীর, তবে ফলাটা এখনও সোজা করে ধরে রেখেছে। বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করল সোহানা, কিন্তু পিছু হটল কোর্সিনেজ, ঠেকাচ্ছে, ঠেকাচ্ছে যতটা পারা যায় কম নড়াচড়া করে, ব্যথায় ঘেমে যাচ্ছে মুখটা, গভীর মনোযোগ দিল শুধু মাথা আর বাহু দুটোকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যে। দু'বার টার্গেট স্পর্শ করল সোহানার তরোয়াল, কোর্সিনেজের শরীর ভেদ করে যেত, তাকে রক্ষা করল ইস্পাতের জ্যাকেট।

দশ সেকেন্ড আক্রমণাত্মক তাড়া করার পর সোহানা উপলব্ধি করল, সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি ও। বিহ্বল ভাব ও ব্যথা কমে আসছে দ্রুত, নিজের শক্তি ও সাহস ফিরে পাচ্ছে কোর্সিনেজ। এরপরও যদি আক্রমণ চালিয়ে যায় ও, স্টপ-হিট বা রিপোস্ট-এর সাহায্যে ওকে গেঁথে ফেলবে প্রতিপক্ষ।

ফিসফিস করল আশরাফ, 'ওহ্, মাই গড···!'

হিসহিস করে উঠল রানা, 'শাট ইওর মাউথ!' তারপর, নরম সুরে, জেনিকে

বলল, 'সব ঠিক আছে, সোহানা ভাল আছে।'

অ্যারেনায় এখনও বিরতিহীন চাপ সৃষ্টি করে চলেছে সোহানা, তবে আগের চেয়ে অনেক সতর্কভাবে। ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে কোর্সিনেজ, প্রায় অনায়াস ভঙ্গিতে আত্মরক্ষা করছে সে। ব্যথার মুখোশটা বদলে নগ্ন ঘৃণার মুখোশ হয়ে উঠছে। একটু পরই, সোহানা জানে, আক্রমণে যাবে কোর্সিনেজ, এবার ওকে খুন করার জন্যে। অসি-যুদ্ধের দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনী অনেক হয়েছে, আর নয়।

কোর্সিনেজের পুনরুজ্জীবিত আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে পারছে সোহানা, অনুভব করছে তার ফলায়। নতুন আত্মবিশ্বাস লাভ করার পিছনে সঙ্গত কারণ আছে তার। কোর্সিনেজ জানে অনেকক্ষণ ধরে লড়ছে ও। অনেকক্ষণ ধরে কঠিন একটা লড়াই। কঠিন এই জন্যে যে, সোহানা চেয়েছিল সাধারণ ও নিরাপদ অসি-যুদ্ধের একটা প্যাটার্ন বা পদ্ধতি যেন প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাতে শেষদিকে হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত ও নিয়মবিরুদ্ধ একটা কৌশলের সাহায্যে কোর্সিনেজের অসচেতনতার সুযোগ নিতে পারে। ওর প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই এরপর দ্রুত হতাশা গ্রাস করবে ওকে, এই হতাশাই ওকে পরাজিত হতে বাধ্য করবে। এ-ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য। এ-ব্যাপারে কোর্সিনেজের কোন সন্দেহ নেই।

কোর্সিনেজ তার দৃষ্টি যদি এক মুহূর্তের জন্যে সোহানার শরীর ও ফলা থেকে সরাতে পারত, বোধহয় এতটা নিঃসন্দেহ হতে পারত না সে। ঘন কালো চোখ দুটোয় হতাশা বা পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব রক্ষার সীমাহীন আকুতি, টিকে থাকার ব্যাকুল আকুলতা, আবার নতুন করে শুরু করার অনুপ্রেরণা।

আক্রমণ শুরু করেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কোর্সিনেজ। জায়গা ছেড়ে পিছু হটছে সোহানা, হঠাৎ উপলব্ধি করল, ব্যাপারটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কোর্সিনেজের—বিশ সেকেন্ডের মধ্যে তিনবার তলোয়ারের ডগা দিয়ে হামলা চালিয়েছে সে। প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ওর মনের ফাইটিং কমপিউটরে ইতিমধ্যে জমা হয়েছে, কারণটা সেখান থেকেই জানতে পারল সোহানা। শিকারকে বধ করার চেষ্টা করছে সে, এবং যেহেতু সে কোর্সিনেজ, হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হতে হবে ফেনসিং-এর আদর্শ ও ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রেখে—সরাসরি আক্রমণে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে যাবে অসির ডগা, যাকে বলা যায় কেতা-দুরস্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি।

সোহানা বুঝতে পারল, এখন আর রিপোস্ট বা স্টপ-হিটে কোন কাজ হবে না। কোর্সিনেজ অসম্ভব দক্ষ। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার একটাই উপায় আছে, তার তলোয়ারের ডগাটাকে ছুটে আসার পথ করে দিতে হবে—ওর নিজের শরীরে।

তবে তাই হোক। ঘন ঘন আক্রমণে শুধু কোর্সিনেজের হিট, প্রথম হিটটা, ধরা হবে। তারমানে এখানে যে হিটটা বধ করবে সেটাই ধরা হবে।

নিচের একটা রেখা বরাবর আক্রমণের ভান করল কোর্সিনেজ, ঠেকাতে শুরু

করল সোহানা, একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে সরে আসছে। ফেনসিং-এর আটটা মৌলিক পজিশনের আট নাম্বারটার অর্থাৎ অকটেভ-এর আশ্রয় নিল ও, কিন্তু এক পলক দেরি করল, তারপর অকস্মাৎ অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করল যেন আতঙ্কের দ্বারা তাড়িত হয়ে। তলোয়ারের নিচের দিকটা ডিজএনগেজ করল কোর্সিনেজ সাবলীলভাবে।

'হ্যালো!' নিখুঁত সম্মুখ-আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, সরাসরি হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে, তার গোটা শরীর দৈর্ঘ্যে বিস্তৃতি লাভ করল, একই সঙ্গে বিজয়ের রুদ্ধশ্বাস চিৎকারটা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। আর ঠিক তখন, একেবারে শেষ মুহূর্তে, আক্রমণের দিকে চোখ রেখে একপাশে সামান্য সরে গেল সোহানা, কোর্সিনেজের তারোয়ালের ডগাটা বিঁধতে দিল ওর অস্ত্র ধরা হাতের বাহুতে, কাঁধ থেকে চার ইঞ্চি নিচে।

হাড়ে ঠেকে গেল ইস্পাত, ধনুকের মত বাঁকা হলো ফলা। বাঁকা ফলার দিকেই হেলান দিল সোহানা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে, পড়ে যাচ্ছে ও, বাম কাঁধটা সামান্য ঘুরিয়ে পাশ ফিরতে চাইছে, ডান হাত থেকে খসে পড়ছে অসি। এই একবারই কোর্সিনেজ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে পিছু হটল না। এখনও তার শরীর সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, ধিকিধিকি আগুনের মত জ্বলছে চোখ দুটো, আক্রোশে ও ঘৃণায়, হতাশায় ও রাগে—তার আদর্শ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে, প্রতিপক্ষ শুধু আহত হয়েছে ও নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে। এখন সমাপ্তিটা হবে স্রেফ কসাইসুলভ সহজ একটা কাজ।

এখনও তাকিয়ে আছে কোর্সিনেজ, ডান হাত থেকে খসে পড়া তলোয়ারটা বালিতে নামার আগেই বাম হাতে ধরে ফেলল সোহানা, ফলাটা স্যাঁৎ করে সামনের দিকে চালাল, তির্যকভাবে ওপর দিকে, ফলে ইস্পাতের জ্যাকেটকে এড়িয়ে চিবুকের নিচে ঘ্যাঁচ করে বিঁধে গেল ডগাটা, সরাসরি ঢুকে পড়ল মগজে।

আক্রমণের মধ্যে রয়েছে সোহানা, শরীরটাকে লম্বা করে দিল, কাত হয়ে পড়ে গেল কোর্সিনেজ। নিজের তলোয়ারটা আঁকড়ে ধরে আছে সে, হ্যাঁচকা টান লেগে সোহানার কাঁধ থেকে মাংস কেটে নিয়ে বেরিয়ে এল ডগাটা। তার পতনের ফলে গলা ও মাথার ভেতর ঢুকে পড়া সোহানার তলোয়ার ওর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। পা ছুঁড়ল কোর্সিনেজ, খানিকটা বালি ছিটকে পড়ল সোহানার পায়ের ওপর, তারপরই স্থির হয়ে গেল শরীরটা। কোর্সিনেজ পা ছোঁড়ায় তিন কি চার ইঞ্চি বালি সরে গিয়ে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, ভেতরে ধূসর রঙের কি যেন দেখা গেল। টলতে শুরু করল সোহানা, দু'পা এগিয়ে এক পা পিছাল, তারপর আবার দু'পা এগোল। কেউ লক্ষ করল না, পা দিয়ে বালি সরিয়ে গর্তটা ঢেকে দিল ও।

অ্যারেনা বা অ্যারেনার আশপাশে কোন শব্দ নেই, শুধু একটা ফুরফুরে বাতাস বইছে। দৃশ্যটা, ভীতিকর ও অবাস্তব, পটে আঁকা স্থির ছবি হয়ে উঠল।

জেনি অনুভব করল তার পাশে থরথর করে কাঁপছে আশরাফ, গলা থেকে বাতাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘ গোঙানির মত একটা আওয়াজ। রানার

কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ শান্ত, 'লড়াই শেষ হয়েছে, জেনি। হাতে আঘাত পেয়েছে ও, ইচ্ছে করে—উপায় ছিল না। তবে কুত্তাটা মরেছে।'

মঞ্চে ঝাঁকি খেতে শুরু করল পাইথন। গলা থেকে বেরিয়ে আসছে উল্লাস—অর্থহীন ধ্বনি। অবশেষে তার মাথাটা পিছন দিকে হেলে পড়ল, গোটা এলাকা কাঁপিয়ে দিয়ে বিস্ফোরিত হলো অট্টহাসি। তার আনন্দে কোন খাদ নেই। চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন, রাগে কাঁপছে পেনিফিদার, হিসহিস করে বলল, 'কোর্সিনেজকে হারানোটা হাসির ব্যাপার, ইউ ক্রেজি ফুল?'

পাইথনের কুৎসিত মুখ ভাঁজ খেয়ে ফুলে আছে, কথা বলার সময় হাঁপিয়ে উঠল সে, 'হাসির ব্যাপার নয় বলতে চাও? উফ, এত আনন্দ জীবনে পাইনি! হোয়াট অ্যান এপিক সারপ্রাইজ! জীবনের এই সময়গুলোর কোন তুলনা হয় না, পেনিফিদার। জীবনে বৈচিত্র্য আনে, আয়ুও বাড়ায়।'

'কোর্সিনেজ মারা গেছে!'

'তুমি আসলে একজন স্থূল দর্শক, পেনিফিদার। যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে, বুঝতে পারছ না? মৃত্যুটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো অপমান, গর্দভ কাঁহিকে! ওহ্ ডিয়ার, ওহ্ ডিয়ার, হাউ ইনসালটিং ফর হিম!' থামল পাইথন, সকৌতুকে তাকাল পেনিফিদারের দিকে। 'সমস্ত দিক বিবেচনা করে, ক্ষতিগ্রস্ত হবার ব্যাপারটা খুব কমই অনুভব করছি আমি। আমাদের প্রজেক্টের কাজ যত এগিয়েছে, মেজর কোর্সিনেজের প্রয়োজন ততই আমাদের কাছে কমেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন কাজে লাগত না সে। তোমার লাগত?'

মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে অ্যারেনার দিকে তাকাল পেনিফিদার। 'ঠিক আছে,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'সোহানার কি হবে?'

এখনও টলছে সোহানা, এক হাতে আহত বাহুটা আঁকড়ে ধরে আছে, এখনও তাকিয়ে রয়েছে কোর্সিনেজের দিকে। ওর জখমটা গভীর হলেও ছোট, রক্ত ঝরার গতি মন্থরই বলা যায়। টলছে ও, তবে পাইথনের উত্তরটা শোনার জন্যে খাড়া হয়ে আছে কান দুটো। নিস্তব্ধ পরিবেশ, তার গলা পরিষ্কার ভেসে এল।

'ও, হ্যাঁ, সোহানা চৌধুরী। তার সম্পর্কে অবশ্যই নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। তবে অপূর্ব এই নাটকটাকে টেনে লম্বা করার কোন ইচ্ছে যদি তোমার থাকে, এখুনি সেটা বাদ দাও। সত্যি ভারি উপভোগ্য হয়েছে, আমেজ ও সৌন্দর্যটুকু আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। কাল নতুন একটা দিন, তাই না? ধরো, ওকে যদি একটা ল্যান্ড রোভারের পিছনে রশি দিয়ে বাঁধা হয়, তারপর গাড়িটা ফুল স্পীডে চালানো হয়, কেমন হবে সেটা, উমম্? এটা স্রেফ একটা প্রস্তাব, ইচ্ছে করলে তুমিও একটা প্রস্তাব দিতে···।'

থামছে না পাইথন, বলেই চলেছে। ঘুরল সোহানা, কালো চাদর আর বুট জোড়ার কাছে ফিরে আসছে। পা টেনে টেনে হাঁটছে ও, ছোটখাট হোঁচট খেল কয়েকটা, মনে হল যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে অ্যারেনায় নামল ব্রুনেল, ব্যস্তভাবে ছুটে আসছে সোহানার দিকে। লোভে ও প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে আছে চেহারা।

আসন ছেড়ে দাঁড়াতে গেল আশরাফ, হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরে ফেলল তাকে রানা, জোর করে বসিয়ে দিল। আশরাফ রেগে গেল, বলল, 'আহ্, ছাড়ো! দেখছ না, সোহানা আহত হয়েছে! ওর কাছে যেতে দাও আমাকে!'

তবু তাকে ছাড়ল না রানা। ঠোঁট না নেড়ে ফিসফিস করল ও, 'চুপ করে বসে থাকো। এখনও কিছু কাজ বাকি আছে ওর।'

নেতিয়ে পড়ল আশরাফের শরীর, মনের ভেতর ঝড় বইছে, ভাবছে ও কি পাগল হয়ে গেছে? কিছু একটা ঘটছে এখানে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে। কিংবা কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কোর্সিনেজ মারা যাবার পর আর কি ঘটতে পারে? আর কি কাজ বাকি আছে সোহানার?

আশরাফ দেখল, চাদরটা তোলার জন্যে ঝুঁকল সোহানা। হাত বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের একটা মোটা ধারা। ওর উরু ও পাঁজর এরই মধ্যে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ছোটখাট ক্ষতও তো কম নয়। টলে উঠল সোহানা, পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল নিজেকে, আবার টলে উঠল। ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে ব্রুনেল, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল সোহানার, তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল ও। ওকে ধরে ফেলল ব্রুনেল, এক হাতে শরীরটাকে স্থির করার চেষ্টা করছে, অপর হাতটা নরম গায়ে হাতড়াচ্ছে। পা দিয়ে তাকে দুর্বলভাবে আঁচড়াল সোহানা, সিধে হবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ব্রুনেল ওকে সিধে হতে সাহায্য করছে না। দু'হাতে ওকে আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করছে এখন। পেনিফিদার গর্জে উঠল মঞ্চ থেকে, 'ব্রুনেল।'

আরও এক মুহূর্ত সোহানাকে ধরে থাকল ব্রুনেল, তারপর বলল, 'কাল তোমার জন্যে অন্য রকম আয়োজন করা হবে, সুন্দরী!' সোহানার মুখে হাতের তালু রেখে ধাক্কা দিল সে। ছিটকে বালির ওপর পড়ল ও। ঘুরল ব্রুনেল, আপনমনে নিঃশব্দে হাসছে।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঁচু হলো সোহানা, চাদরটা এখনও বুকের ওপর ধরে আছে। শরীরটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, মাথাটাও, ভয়ানক ক্লান্ত।

মঞ্চ থেকে গার্ডদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল পাইথন, আরবী ভাষায় কি যেন বলল। তারপর রানার দিকে তাকাল সে। 'ওকে তুমি সাহায্য করতে পারো, মাসুদ রানা। আর, শোনো, লক্ষ্য রাখবে রাতটা যেন আরামে কাটাতে পারে ও। কাল সারাটা দিন আমরা সার্কাস দেখব।'

আট

কমনরুমের দরজা বন্ধ হবার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। নিজের বিছানায় বসে রয়েছে সোহানা, আহত হাতটা ধীরে ধীরে নাড়ছে, যাতে আড়ষ্ট হয়ে না যায়।

ক্ষতগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করেছে রানা, নিজের ছেঁড়া শার্ট গরম পানিতে সেদ্ধ করে গভীর ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। পানির কোন অভাব নেই। খাবারের সঙ্গে আজও সন্ধ্যায় ওদের সবার জন্যে পানি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ এক ফোঁটা ব্যবহার করেনি, শুধু সোহানা বাদে। আজ ওরা কেউ রাতের খাবারও খায়নি। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন ও তাঁর আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যদেরও পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে রানা। এই মুহূর্তে জেনির বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে ও। ওর সামনে ব্রুনেলের কালো নোট বুকটা খোলা রয়েছে। নোট-বুকের ভেতর ঢোকানো ছিল একটা পেন্সিল, সেটা এখন রানার হাতে। যে-কোন হস্তাক্ষর নকল করতে পারে ও, তবে তার আগে একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। এই মুহূর্তে ঠিক তাই করছে ও। বিল ওয়াটসনের বিছানায় একটা টাইম ম্যাগাজিন পাওয়া গেছে, মক্‌শ করার কাজটা ওটারই মার্জিনে সারা হচ্ছে।

নোট-বুকে ব্রুনেল যা কিছু লিখেছে সবই ইংরেজিতে। কোন কোন শব্দ সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে সে, যেমন ডিজপোজাল লেখার সময় 'ও' এবং 'এ' অক্ষর দুটো ব্যবহার করেনি। প্রথমদিকের পৃষ্ঠাগুলোয় রয়েছে গোটা অপারেশনের বিস্তারিত প্ল্যান। খানিক পরপর কিছুটা করে ফাঁক রাখা হয়েছে, সংশোধন ও মন্তব্য করার জন্যে। প্ল্যানের প্রতিটি অংশ সম্পন্ন হবার পর নিচে লেখা হয়েছে বিস্তারিত রিপোর্ট। পরের পাতাগুলোয় রয়েছে দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি।

সামান্য কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে আশরাফ, ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকিয়ে, হাত দুটো মরা সাপের মত ঝুলছে। শরীরের সমস্ত নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে তার, অসাড় ও খালি হয়ে গেছে মাথাটা। ধীরে ধীরে কথা বলল সে, 'কোর্সিনেজের সাথে লড়ার পিছনে এটাই তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ছিল···ওটা হাতে পাবার জন্যেই···?' চোখ ফিরিয়ে নোট বুকটার দিকে তাকাল সে।

কাঁধ আর বাহু ঘোরাচ্ছে সোহানা। সারা শরীর ব্যথা করছে ওর, বাহুর ক্ষতটা দপদপ করতে শুরু করেছে, তবে নিজেকে ওর ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে না। বলল, 'বলতে পারো, এটা একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আর কোনভাবে ব্রুনেলের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

মাথাটা ঘন ঘন নাড়ল আশরাফ, যেন পরিষ্কার করতে চাইছে। 'কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে তোমাকে ধরবে সে?'

'জানতাম। মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষমানুষের দৃষ্টি চিনব না? আমার দিকে হাত বাড়াবার নোংরা একটা প্রবণতা আগেই আমি লক্ষ করেছিলাম, প্রথম রাতে আমাদেরকে যখন সার্চ করা হলো। জানতাম, গায়ে যদি কাপড়চোপড় কম থাকে, নিজেকে সামলাতে পারবে না সে।' গম্ভীর হলো সোহানা। 'শেষ দিকে ইচ্ছে করে আহত হতে ভাল লাগেনি আমার, কিন্তু হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারায় কাজ না হওয়ায় আর কোন উপায়ও ছিল না। তবে, হাতে আঘাত লাগায় টলমল করার একটা অজুহাত পেয়ে যাই আমি।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে আশরাফ। 'কিন্তু···,' বলে আবার মাথা নাড়ল সে। '···কিন্তু তুমি জানতে না কে জিতবে!'

আশরাফের ঝুলে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে, তার কাঁধে একটা হাত রাখল সোহানা। 'বেশ, জানতাম না। তবে এখন তো জানি? সেটাই আসল কথা। এবার তুমি শান্ত হও দেখি। ভাগ্য যদি আরেকটু ভাল হয়, খুব শিগগিরই দেখতে পাবে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেছি আমরা।'

সিধে হল রানা, নোট-বুকে কি লিখেছে খুঁটিয়ে দেখল। প্রথম দিকের একটা পাতায় লেখা হয়েছে গুপ্তধন মাটি খুঁড়ে তোলার কাজ সারতে হবে। লেখাগুলো বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়: 'পি. দায়িত্ব নেবে। প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে এইচ. আর তার পার্টি পাথর ধসে চাপা পড়ে জীবন্ত সমাধিলাভ করে। (সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে রাখতে হবে আগেই)।'

এরপর খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। ফাঁকা জায়গার মাথায় পরে লেখা হয়েছে, 'এম. আর তার পার্টি? এ. ও এম. মারা যাবে পালাক্রমে।'

'পরের লেখাটা দেখে মনে হয়, আদি প্ল্যানের অংশ হতে পারে, আবার পরেও ঢোকানো হতে পারে। লেখা হয়েছে, 'বি. আর তার সেসনাকে উড়িয়ে দিতে হবে। ফেরার পথে টি-বোমার বিস্ফোরণ।'

শেষ এই লেখাটা রানার কীর্তি, অত্যন্ত সাবধানে লিখেছে। নোট বুকটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিল ও, তারপর টাইম ম্যাগাজিনের পাতাগুলো সদ্য ধরানো আগুনে পোড়াতে বসল। নকল লেখাটা খুঁটিয়ে দেখল সোহানা, মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে, বলল, 'দারুণ হয়েছে, রানা।' নোট বুকটা ফিরিয়ে দিল ও।

আশরাফ বলল, 'ক্রুনেল নিশ্চয়ই জানতে পারবে নোট বুকটা তার কাছে নেই। সে যদি সন্দেহ করে ওটা তুমি তার পকেট থেকে মেরে দিয়েছ, তখন কি হবে?'

জবাব দিল জেনি, আশরাফের পাশেই বসে আছে সে। 'এরকম একটা সন্দেহ তোমার হত কি? ওরকম একটা লড়াইয়ের পর, সোহানার হাত ওভাবে জখম হবার পর? না। সব জায়গায় খুঁজবে ক্রুনেল, কিন্তু এখানে নয়।'

'শুধু দেখতে ভাল তা নয়, মেয়েটার দেখছি বুদ্ধিও যথেষ্ট!' হাসল রানা।

'ভয়ে কুঁকড়ে গেছি আমি, সুন্দর আর থাকলাম কোথায়!'

হেসে উঠল সোহানা। 'ভয় পেলে আরও সুন্দর দেখায় তোমাকে।'

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর সেসনার আওয়াজ পেল ওরা। দূর থেকে আসছে আওয়াজটা। উপত্যকার প্রবেশপথের সামনে এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করবে ওটা। আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। গার্ডরা বোধহয় এখন কার্গো নামাচ্ছে। ফাঁকা প্রান্তরে বাতাসের গতি খুব তীব্র, রশি দিয়ে বাঁধতে হবে প্লেনটাকে। দমকা বাতাস অনেক সময় হঠাৎ ঝড়ের মত হয়ে ওঠে। তারপর ট্যাংকগুলোয় ফুয়েল ভরতে হবে। ইতিমধ্যে রানার জানা হয়ে গেছে, ট্যাংকগুলো ভরা হয় ল্যান্ডিং-এর পরপরই। দু'দিন আগের ঘটনা, কমনরুম থেকে বিল ওয়াটসন বেরিয়ে যাবার দশ মিনিট পরই প্লেনটা টেক-অফ করে। খুলে রাখা প্লাগ লাগাতে ওই দশ মিনিটই লাগার কথা। প্লেনটাকে অচল করে রাখার জন্যে প্লাগটা নিজের কাছে রেখে দেয় পাইথন।

'আমি কিন্তু চাদরটার কথা ভুলিনি,' হঠাৎ বলল আশরাফ। 'কাল রাতে অ্যাকুয়েডাকটে ঢোকার সময় রানার সঙ্গে ছিল ওটা, কিন্তু ফেরার পর ছিল না। ওটা যে আমার চাদর, তা-ও আমি ভুলিনি।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'আমি জানি চাদরটা কোথায়।'

রানা ছাড়া বাকি দু'জন ওর দিকে মুখ তুলল। 'কোথায়?' একযোগে জানতে চাইল আশরাফ ও জেনি।

'অ্যারেনার বালির তলায়।'

হাঁ হয়ে গেল ওরা দু'জন, কারও মুখে কথা যোগাল না। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল জেনি, 'মানে?'

'মানে হলো, আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে চাদরটা বালির তলায় বিছিয়ে রেখে এসেছিল রানা,' বলল সোহানা।

'কারণ?'

'কারণ, আমি হেরে যাচ্ছি দেখলে, কোর্সিনেজ আমাকে তরোয়াল দিয়ে গেঁথে ফেলতে যাচ্ছে দেখলে, চাদরটা ধরে টান দিত ও, ফলে পড়ে যেত সে।'

'টান দিত? অসম্ভব···কিভাবে?'

'সেটা আমার জানা নেই, রানাই ভাল বলতে পারবে।' ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তবে আন্দাজ করতে পারি।' আশরাফের দিকে তাকাল ও। 'রানার বসার ভঙ্গিটা তোমরা লক্ষ করোনি, আমি যখন লড়ছিলাম? অ্যারেনার বালিতে লম্বা করা ছিল ওর পা দুটো, দু'পায়ের মাঝখানে ছিল হাত। আমার বিশ্বাস, চাদরের সঙ্গে কিছু বাঁধা ছিল, সম্ভবত এক বা একাধিক রশি। সেগুলোর অপর দিক ছিল রানার হাতের কাছাকাছি, প্রয়োজন হলেই টান দিতে পারত। তবে প্রয়োজন হয়নি।'

ঝট করে রানার দিকে ফিরল আশরাফ। 'সত্যি? যদি সত্যি হয়, আমাদেরকে আগে কেন জানানো হয়নি? সোহানার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আছে জানলে অতটা ভয় পেতাম না।'

'এ-ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না,' বলল রানা। 'আমি শুধু জানি, চাদরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

এক মুহূর্ত পর আশরাফ বলল, 'কিন্তু এখন যদি চাদরটা ওরা দেখে ফেলে?'

'দেখে ফেললে আমরা আরেক দফা পাইথনের অট্টহাসি শুনতে পাব,' মন্তব্য করল সোহানা।

রেগেমেগে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আশরাফ, কমনরুমের দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে থেমে গেল সে। ভেতরে ঢুকল বিল ওয়াটসন, লোহার বারগুলো ব্রাকেটে ঢোকার শব্দ ভেসে এল। অলস পায়ে হেঁটে এসে একটা খালি বিছানার পাশে দাঁড়াল সে, হাতের চাদরটা নামিয়ে রাখল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কমনরুমের চারদিকে তাকাল।

রানা বলল, 'কেমন আছ হে, ওয়াটসন?'

'হাই, রানা।' হাতে সিগারেটের প্যাকেট, ওদের দিকে এগিয়ে এল সে।

'হাই, ম্যা'ম।' সিগারেটের প্যাকেটটা অফার করল সবাইকে।

সবাই প্রত্যাখ্যান করল, রানা বলল, 'তুমি বরং নিজেই আরেকটা ধরাও।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়াটসন। তারপর সোহানার দিকে ফিরল সে, বলল, 'শুনলাম কোর্সিনেজের সাথে পাল্লা দিয়েছ তুমি, ম্যা'ম। একেবারে পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছ, কেমন?'

রানা বলল, 'একটা দরকারি জিনিসও তুলে এনেছে, ওয়াটসন। ব্রুনেলের নোট বুকটা দেখেছ কখনও?'

মৃদু হাসল ওয়াটসন। 'ভুলেও হাতছাড়া করে না। কেউ নাক ঝাড়লেও লিখে রাখে ব্যাটা।'

খোলা নোট বুকটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'পড়ে দেখো। তোমার আগ্রহ হবার কথা।' ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠল ওয়াটসনের। নোট বুকটা নিয়ে খোলা পৃষ্ঠার ওপর চোখ রাখল সে।

ধীরে ধীরে পড়ল ওয়াটসন, হঠাৎ করে তার চেহারা ভাবলেশহীন হয়ে গেল, সবগুলো লেখা আরেকবার পড়ল সে। অবশেষে মুখ তুলে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বাহ্, চমৎকার। এবার নিয়ে ভিক্টর ক্যানিঙের হয়ে তিনবার কাজ করছি। কখনও ভাবিনি আমার দিকে আঙুল তাক করবে সে।'

রানা বলল, 'এখনকার ব্যাপারটা এত বড় যে সে বোধহয় কোন সাক্ষী রাখতে চাইছে না। এমনকি তোমাকেও নয়।'

'এইমাত্র আমি তার চাকরি ছেড়ে দিলাম।' নোট বুকটা রানাকে ফিরিয়ে দিল সে।

'এইমাত্র নতুন একটা চাকরি পেয়েছ তুমি। সেসনায় তুলে নিয়ে চলো আমাদের, ওয়াটসন। ত্রিশ হাজার ডলার।'

স্থির হয়ে গেল ওয়াটসন, দু'আঙুলে নিচের ঠোঁটটা টিপে ধরে চিন্তা করছে।

'কি হলো, ওয়াটসন?' জানতে চাইল সোহানা। 'ইয়েস অর নো?'

'ঝুঁকিটা বড় বেশি হয়ে যায়, ম্যা'ম।' রানার দিকে তাকাল ওয়াটসন। 'তোমরা আমাকে সাবধান করায় সত্যি আমি কৃতজ্ঞ, রানা। কিন্তু চিরকাল আমি গা বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত, প্রতিশোধ নেয়ার মত পৌরুষ আমার নেই। কাল আমি স্রেফ গায়েব হয়ে যাব, আর ফিরব না—ব্যস।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আর দু'ঘণ্টা পর এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন শব্দ হবে না। ত্রিশ হাজার ডলার, ওয়াটসন। তুমি যদি রাজি না হও,' কাঁধ ঝাঁকাল ও, '...বুঝতেই পারছ, এখান থেকে তোমাকে আমরা যেতে দিতে পারি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াটসন। 'সেসনা উড়বে না, রানা। প্লাগ রয়েছে পাইথনের কাছে।'

'জানি,' বলল রানা। 'তোমার ব্যাগেও এক সেট আছে, ওয়াটসন। আরও আছে একটা প্লাগ স্প্যানার। মাটিতে থাকুক আর আকাশে, তোমার প্লেন তুমি আর কারও মর্জির ওপর ছেড়ে দিতে পারো না।'

অবাক হয়ে আশরাফ দেখল, ওয়াটসনের ঠোঁটে হাসি ফুটছে। রানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, 'দেখা যাচ্ছে তুমি আমাকে খুব ভাল চেনো।'

'তাহলে কথা হয়ে গেল?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াটসন। 'গেল।'

'কথা দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাদের হয়ে কাজ করবে তুমি?'

'দিচ্ছি।'

পরম স্বস্তিবোধ করল আশরাফ, উপলব্ধি করল অচেনা এই লোকটার প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। বিল ওয়াটসন এখন থেকে পুরোপুরি রানার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে, যদিও তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য একটু অদ্ভুত ধাঁচেরই বটে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কমনরুমের চারদিকে তাকাল ওয়াটসন। আশরাফের মনে হলো, কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে সে। তার আগেই বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সোহানা, কাঁধটা নাড়া খাওয়ায় ব্যথায় মুখ কোঁচকাল, বলল, 'দু'একটা কাজ এখনও বাকি আছে। আমার সাথে কিছুক্ষণ হাঁটো, ওয়াটসন। চাই না শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে পড়ুক।'

'শিওর।' সোহানার সঙ্গে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল ওয়াটসন।

রানা বলল, 'বসে থাকার সময় নেই। আমাদের একটা টার্গেট খাড়া করতে হবে, আশরাফ। একটা বিছানা খাড়া করলে কেমন হয়, বলো তো? স্প্রিঙের সাথে ভাঁজ করা চাদর আটকে দিলাম। কুঁড়ের বাদশা, এখনও তুমি উঠছ না যে?'

দাঁড়াল আশরাফ। 'টার্গেট মানে?'

'নরম একটা টার্গেট। তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করব। ওগুলো ভেঙে গেলে চলবে না।'

রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, অ্যাকুয়েডাক্ট থেকে অন্ধকার মরুভূমির হিম বাতাসে বেরিয়ে এল রানা। টানেলের ভেতর দিয়ে আসতে প্রচুর সময় নিয়েছে ও, কারণ ধনুক ও তীরগুলো সামনে রেখে ঠেলে আনতে হয়েছে। ছুরি দুটো বেল্টের সঙ্গে শিরদাঁড়ার কাছে রেখেছে।

পাহাড়ের বাঁক লক্ষ করে এগোল রানা, চাঁদের আলোয় সমতল, পাথুরে জমিন আবছা দেখাল। পাহাড়ের ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল ও, তাকিয়ে আছে এয়ারস্ট্রিপের দিকে। ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেসনা। এখানে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে ও। ত্রিশ মিনিটে যদি কোন গার্ড না নড়ে, মনে করতে হবে ঘুমাচ্ছে সে।

দশ মিনিট পর নড়ল লোকটা। দপ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, সিগারেট ধরাচ্ছে গার্ড। সেসনার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সে, উপত্যকার প্রবেশপথের দিকে হেঁটে আসছে। প্রবেশপথের মুখটা রানার ডান দিকে একশো গজ দূরে।

পাথরের পাঁচিল ঘেঁষে এগোল রানা, তির্যক একটা পথ ধরে। লোকটা অর্ধেক

দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে, রানার কাছ থেকে এখন ত্রিশ কদম দূরে সে। ধনুকের ছিলায় একটা তীর লাগাল রানা, দাঁড়িয়েছে এক পা সামনে রেখে, ডান কাঁধটা সরাসরি টার্গেটের দিকে তাক করা, শরীরের ভর খানিকটা সামনের দিকে। লোকটা এই মুহূর্তে স্রেফ ছায়ামূর্তি নয়। কাঠামোটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। ধনুকটা তুলল ও, টান দিল ছিলায়, জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্-টট্ আওয়াজ করল দু'বার।

ঝট করে ঘুরল লোকটা, তীক্ষ্ণচোখে তাকাল। সেই মুহূর্তে তীরটা ছেড়ে দিল রানা, শুনতে পেল ঘ্যাঁচ করে টার্গেট ভেদ করল সেটা। হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো লোকটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পাথুরে জমিনে খটাস করে শব্দ করল সাবমেশিনগানটা। অপেক্ষা করছে রানা, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তীর ছিলায় লাগানো হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে স্থির পাথর। উপত্যকার মুখে কোন নড়াচড়া নেই। ষাট সেকেন্ড পর সাবধানে এগোল রানা।

মারা গেছে লোকটা। ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা তীরটা তার বুকে ঢুকেছে, হৃৎপিণ্ডের কিনারা ভেদ করে। সাবমেশিনগানটা ইচ্ছে করেই নিল না রানা। ওটা ব্যবহার করলে শব্দ হবে, আর শব্দ হলে সবাইকে নিয়ে পালানো সম্ভব নয়। পাহাড় প্রাচীরের কাছে ফিরে এল রানা, ছায়ার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উপত্যকার প্রবেশমুখের দিকে এগোল।

প্রবেশমুখে কোন পাহারা নেই। একজনই বোধহয় সেসনা আর এদিকটায় নজর রাখছিল। দু'পাশে খাড়া প্রাচীর, মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। পাঁচ মিনিট পর, ফুলে ওঠা পাঁচিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কমনরুমের দরজাটা দেখতে পেল ও। সরাসরি সামনে দরজাটা, একটু তির্যকভাবে ওর দিকে মুখ করে রয়েছে, কারণ পাঁচিলটা এখান থেকে ভেতর দিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে।

শিপস্কীন জ্যাকেট পরা গার্ড এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করছে, কাঁধ থেকে ঝুলছে স্নাইয়ার এমপি ফরটি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রানা বুঝতে পারল, লোকটা একা। এর আগে, কমনরুমের দরজা যতবার খোলা হয়েছে, ভেতর থেকে দু'জন গার্ডের আভাস পেয়েছে ওরা। গুপ্তধন কোথায় আছে জানার পর পাইথন বোধহয় সেখানে পাহারা বসিয়েছে।

এদিকের জমিন শুধুই পাথর, লোকটা পড়ার সময় তার অস্ত্র শব্দ করবে ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল রানা। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল, ইতিমধ্যে যদি লোকটা বসে বা কাঁধ থেকে অস্ত্রটা নামিয়ে খাড়া করে রাখে দেয়ালে।

না, থামার কোন লক্ষণ নেই। রানা ভাবল, তীর ছুঁড়ে কাজ নেই, ব্যবহার করতে হবে ছুরি। তারমানে ক্রল করে আরও অনেক সামনে বাড়তে হবে, তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ছুরি হাতে। মন স্থির করল রানা, এই সময় থামল লোকটা। দরজার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে, কানটা চেপে ধরল কবাটে। ধনুক ও ছিলার সমস্ত শক্তি নিয়ে ছুটে গেল রানার তীর, দরজার গায়ে সেঁটে থাকা গার্ড কিছুই না বুঝে মারা গেল, তীরের ডগা এক ইঞ্চি গেঁথে গেল কাঠে।

ঝুলে পড়ল লোকটা, তীরটাকে নামিয়ে আনছে। কাঠ থেকে বেরিয়ে এল

তীর, এই সময় পৌঁছে গেল রানা, দু'হাতে ধরে ফেলল শরীরটা, ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল দরজার পাশে। সিধে হলো রানা, ব্রাকেট থেকে স্টীল বার দুটো সরাল।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল ওয়াটসন। তার পিছনে কমনরুম অন্ধকারে ঢাকা। ফিসফিস করল রানা, 'সোহানার কাজ শেষ হয়েছে?'

নিচু গলায় কথা বলল ওয়াটসন, 'ওদেরকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে ম্যা'ম। যা বলা হবে তাই শুনবে সবাই।'

নিঃশব্দে মাথাটা একদিকে ঝাঁকাল রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে কমনরুম থেকে বেরিয়ে গেল ওয়াটসন, উপত্যকার বাইরে চলে যাচ্ছে, ভাঁজ করা চাদরটা বগলের নিচে।

ওয়াটসনকে অনুসরণ করল আশরাফ ও জেনি, জেনির হাত ধরে আছে আশরাফ। দরজার পাশে পড়ে থাকা গার্ডের দিকে একবার তাকাল সে, পিঠে গাঁথা রয়েছে তীরটা, তারপর রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে ঝাঁকাল মাথাটা। কথা না বলে জেনিকে নিয়ে চলে গেল সে। সবার মত তার ওপরও সোহানার নির্দেশ আছে, কোন কথা বলা চলবে না।

স্বামীর হাত ধরে হেঁটে এলেন মিসেস হোয়াইটস্টোন। প্রফেসরের মুখে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে একটা রুমাল। ভদ্রলোকের যা মানসিক অবস্থা, তাঁর বাকশক্তি না থাকাটাই সবার জন্যে নিরাপদ বলে মনে করেছে সোহানা। বয়োবৃদ্ধ দম্পতিটির পিছন পিছন এল আর্কিওলজিকাল টীমের বাকি ছ'জন সদস্য, জোড়ায় জোড়ায়। সবাই প্রায় পা টিপে টিপে হাঁটছে তারা, ভয়ে টান টান হয়ে আছে মুখের চামড়া।

সবার শেষে এল সোহানা। ওর পিঠে চাদর মোড়া একটা বান্ডিল রয়েছে, দু'হাতে একটা করে পানি ভর্তি ক্যান। রানাকে পাশ কাটাবার সময় চোখ মটকাল ও। পিছিয়ে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল রানা। 'এগুলো তোমার আশরাফকে দেয়া উচিত ছিল,' বলে সোহানার পিঠ থেকে বান্ডিলটা নামিয়ে মেঝেতে রাখল, চেয়ে নিল ক্যান দুটোও। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানা, মিছিলের পিছু নিল সোহানা। ক্যান দুটো বান্ডিলের পাশে নামিয়ে রেখে গার্ডের পাশ থেকে স্নাইয়ারটা তুলে নিল রানা, তারপর তাকে টেনে কমনরুমে ঢোকাল। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় বার লাগাল ও, বান্ডিল ও ক্যান দুটো তুলে পিছু নিল সোহানার।

মাটিতে বসে চিন্তা করছে আশরাফ পনেরো মিনিট পেরুতে কতক্ষণ লাগে। প্লাগ লাগাতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগবে না বলে জানিয়েছে ওয়াটসন।

ছোট্ট একটা বৃত্ত রচনা করে মাটিতে বসে রয়েছে আর্কিওলজিকাল টীমের সদস্যরা, সেই বৃত্তেরই একটা অংশ আশরাফ ও জেনি। দু'এক মুহূর্ত পরপর ভীত-সন্ত্রস্ত লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আশরাফ। ওদের জন্যে করুণাবোধ করা উচিত তার, জানে সে, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড অস্থিরতা ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না। ওদের জন্যে পরে দুঃখ করা যাবে, এখন শুধু দয়া করে ওরা যদি শান্ত ও অনুগত থাকে তাহলেই খুশি সে। বাকি আর কিছুর কোন গুরুত্ব নেই। অস্থির

নার্ভগুলো মনে হচ্ছে চিৎকার করছে তার শরীরের ভেতর।

তার পাশে গায়ে চাদর মুড়ে বসে রয়েছে জেনি। জেনির কাঁপুনিটা অনুভব করতে পারছে আশরাফ। ইচ্ছে হলো কিছু বলে অভয় দেয়, কিন্তু কথা বলা নিষেধ। উপত্যকা থেকে বেরুবার পর কেউ কোন শব্দ করেনি। বিল ওয়াটসনকে সাহায্য করছে রানা ও সোহানা। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কারও কিছু করার নেই।

পাঁচ মিনিট বা পাঁচ বছর পর আশরাফের কাঁধ ছুঁয়ে ইশারা করল সোহানা। সেসনার দরজা খোলা রয়েছে। এই প্রথম কথা বলল সোহানা, ফিসফিস করে, 'তুমি আর জেনি ওয়াটসনের সাথে বসবে।'

জেনির হাত ধরে দাঁড় করাল আশরাফ। পানি ও পেট্রলের খালি ড্রাম নিয়ে ফিরে যাবার কথা সেসনার, কাল রাতে সেগুলো তোলাও হয়েছে, এক এক করে আবার সব নামিয়ে এনেছে রানা। খালি হলেও একেকটা কম ভারী নয়। সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে ওঠার সময় আশরাফ ভাবল, কোন শব্দ না করে কাজটা রানা করল কিভাবে!

কন্ট্রোলে বসে রয়েছে ওয়াটসন। ইঙ্গিত করল সে, তার ডান দিকে ককপিটের খালি মেঝেতে সামান্য যে জায়গা রয়েছে সেখানেই ওদের দু'জনকে কোনরকমে বসতে হবে।

এরইমধ্যে বাকি সবাই প্লেনে উঠতে শুরু করেছে। ভিড় দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল আশরাফ। সেসনার ধারণক্ষমতা অনুসারে পাইলট বাদে পাঁচজন আরোহী উঠতে পারে। কিন্তু এখন পাইলট ছাড়াই বারোজনকে বইতে হবে। বারোজন··· সর্বনাশ, দিগুণ ওজন! কথাটা আগে ভাবেনি সে। প্লেন উড়বে তো? যদি টেক-অফ না করে?

কাঁধ ঝাঁকাতে গিয়ে আশরাফ অনুভব করল, ওর চারপাশে লোকজনের এত ভিড় যে একচুল নড়ার উপায় নেই। সদরঘাট থেকে রামপুরায় যে বাসগুলো চলাচল করে সেগুলোকে মুড়ির টিন বলা হয়, সেই বাসেও এভাবে লোক ভরা হয় না। এত লোক···প্লেন সত্যি আকাশে উঠতে পারবে তো? নিজেকে ধমক দিল আশরাফ, এ-সব দিক নিশ্চয়ই রানা বা সোহানা ভেবে রেখেছে, তার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। তাছাড়া, বিল ওয়াটসন অত্যন্ত দক্ষ পাইলট। সমস্যার সমাধান তার জানা আছে।

তার আশপাশে উবু হয়ে বসে আছে লোকজন, ভাল করে বসার জায়গা নেই। পিছন থেকে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল সে। উইন্ডশীল্ড দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াটসন। হঠাৎ রাগ হলো আশরাফের, প্লেন স্টার্ট দিচ্ছে না কেন? দু'মিনিট পেরিয়ে গেল। নড়ে উঠল ওয়াটসন, কন্ট্রোলে প্রজাপতির মত ব্যস্ত হয়ে উঠল তার হাত।

এঞ্জিনের আকস্মিক গর্জনে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল আশরাফের। জেনির সঙ্গে তার শরীর এক হয়ে আছে, থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। তাকে শক্ত করে ধরে থাকল সে, তারপর অনেক কষ্টে ঘাড়টা বাঁকা করে সোহানাকে দেখার চেষ্টা করল। চোখের দু'ইঞ্চি সামনে ওর পিছনে বসা লোকটার নোংরা শার্ট ছাড়া কিছুই দেখতে

পেল না। ডায়াল পরীক্ষা করছে ওয়াটসন। কিছুই ঘটছে না, স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অচল দাঁড়িয়ে রয়েছে সেসনা। আশরাফের চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো। এঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। গার্ডরা শুনতে পাবে। ঘুম থেকে জাগানো হবে পাইথনকে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসবে সবাই।

ঘাড় ফিরিয়ে আশরাফের দিকে তাকাল ওয়াটসন, মৃদু হাসল। 'এঞ্জিন গরম করা দরকার,' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'ভাইরে ভাই, সেসনা বেটির আজ মহা পরীক্ষা! এত ভার কখনও বইতে হয়নি তাকে। আজ তার সবটুকু শক্তি লাগবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল আশরাফ, দেখে মনে হলো ভেঙচাল। আরও ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। হাত দুটো নড়ে উঠল ওয়াটসনের। ঝাঁকি খেল প্লেন, সামনের দিকে এগোল ওরা। আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল আশরাফ। সামনের দিকে তাকাল সে। জমিন সমতল ও সমান। টেক-অফ করার জন্যে যথেষ্ট লম্বা।

পাইলটের দিকে তাকাল সে। ওয়াটসনের চেহারা বরাবরের মত নির্বিকার। তবে চোখ দেখে বোঝা যায়, নিজের কাজে গভীর মনোযোগী সে। এঞ্জিনের গর্জন আরও বাড়ল, ঘন ঘন ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোচ্ছে সেসনা।

ঘামছে আশরাফ। প্লেনের ভেতরটা অত্যন্ত গরম। সে ভাবল, সেসনা যদি টেক-অফ করতে না পারে, তারপর কি ঘটবে? উল্টে যাবে প্লেন? নাকি স্রেফ দাঁড়িয়ে পড়বে? কিংবা হয়তো···।

জেনির গলাটা আর্তচিৎকারের মত শোনাল, 'আমরা আকাশে!'

আশরাফ উপলব্ধি করল, প্লেনটা এখন আর ঝাঁকি খাচ্ছে না। উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে, ওপরে তাকাল সে। দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। উইন্ডশীল্ডের ওপরের কোণ থেকে একটা তারা ক্রমশ নিচে নামছে দেখে বুঝল ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে সেসনা।

আরও তিন মিনিট পর ওয়াটসনের উঁচু হয়ে থাকা কাঁধ শিথিল হলো। ঘাড় ফিরিয়ে আবার আশরাফের দিকে তাকাল সে, হাসল হঠাৎ, গলা চড়িয়ে বলল, 'তোমরা এই ক'দিনে যথেষ্ট রোগা হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি।'

আশরাফের ভেতর কি যেন একটা বিস্ফোরিত হলো, পাগল করা আনন্দে নেচে উঠল তার প্রতিটি রোমকূপ। ওরা মুক্ত! পাইথন, পেনিফিদার, গুপ্তা ও খুনীরা মাটিতে রয়ে গেছে, ওদের কোন ক্ষতি করার সাধ্য নেই। তার হাঁটুর ওপর অনবরত ঘুসি মারছে জেনি, অপার আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে সে-ও।

ঘাড়টা আবার বাঁকা করার চেষ্টা করল আশরাফ, চিৎকার করে ডাকল, 'সোহানা!' এখনও ওকে দেখতে পাচ্ছে না সে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল ওয়াটসন। ফিরল আশরাফ, মাটির দিকে একটা আঙুল তাক করল পাইলট।

'না,' বলল ওয়াটসন। 'প্লেনে নয়, নিচে। রানা ও ম্যা'ম হাঁটছে।'

'হোয়াট?' দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল আশরাফ, হাতের চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখল ওয়াটসন।

'ভার,' বলল সে, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, তবে ব্যাখ্যা করছে খোশ-মেজাজে। 'সবাইকে তোলা সম্ভব ছিল না। ওদের দু'জনকে রেখে

যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমি চারজনকে রেখে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রানা আমার কথায় কান দেয়নি। ভাইরে ভাই, টেক-অফটা অনুভব করেছ তুমি? আর যদি এক প্যাকেট সিগারেটও বেশি থাকত, সেসনা বেটি স্রেফ···।'

গলার রগগুলো ফুলে উঠল আশরাফের। 'কিন্তু সোহানা অসুস্থ!'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াটসন। 'এই প্রথম নয়, আগেও আহত হয়েছে ম্যা'ম। তাছাড়া, ওর সঙ্গে রানা আছে।' শার্টের পকেটে চাপড় মারল সে। 'নোট-বুকের পাতায় একটা চিঠি লিখে দিয়েছে ম্যা'ম। এক লোককে ওটা দেখালেই আমি আমার টাকা পেয়ে যাব। আরেকটা কাগজে ম্যা'ম তোমাকে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। ল্যান্ড করার পর কাজগুলো করতে হবে।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' এখনও বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে আশরাফের চোখ। 'রানা ব্যাপারটা মেনে নিল, সোহানা অসুস্থ জেনেও? আর কোন উপায় ছিল না?'

'ছিল। আমি বলেছিলাম আর্কিওলজিস্টদের দু'জনকে রেখে যাই। কিন্তু ম্যা'ম আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল। আর রানা চেয়েছিল ম্যা'মের বদলে তুমি থাকো ওর সাথে, কিন্তু···।'

'আমি আপত্তি করতাম না! কিন্তু?'

'কিন্তু ম্যা'ম রাজি হলো না। বলল, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া তার দায়িত্ব।'

নেতিয়ে পড়ল আশরাফ, তার শরীর কাঁপছে। বাহুতে ব্যথা অনুভব করল সে, বুঝল জেনি তাকে খামচে ধরে আছে। মেয়েটার দিকে তাকাতে দেখল, নিঃশব্দে কাঁদছে সে। ধীরে ধীরে তাকে নিজের কাঁধের ওপর টেনে আনল আশরাফ। তার বুকে অনবরত ঘুসি মারল জেনি, অবোধ শিশুর মত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ওদেরকে এনে দাও! আমি ওদের কাছে যাব!'

আশরাফের চোখ ভিজে উঠল, নিজের কথা ভুলে ব্যস্ত হয়ে উঠল জেনিকে সান্ত্বনা দিতে। 'চিন্তা কোরো না, জেনি। সব দিক ভেবেই নিচে রয়ে গেছে ওরা। আমি বলছি, ওদের কোন বিপদ হবে না···।'

আধ ঘণ্টা হলো সেসনা স্কাইওয়াগন চলে গেছে। উপত্যকার প্রবেশমুখের কাছ থেকে ভেসে আসা শোরগোলের আওয়াজ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল। কোথাও আর কেউ নড়ছেও না। ফাঁকা জায়গায় পড়ে থাকা গার্ডের লাশ তুলে নিয়ে গেছে দু'জন লোক। বড় একটা ফ্লাশ-ল্যাম্প নিয়ে উপত্যকার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ক্রনেলও, পেট্রল স্টোরটা দেখে গেছে সে। ভেতরটা সার্চ করা হয়নি। সম্ভবত কোথাও সার্চ করেনি ওরা। পাইথনের তরাট গলা একবার মাত্র চড়েছে, তারপরই থেমে গেছে সমস্ত হৈ-চৈ।

পরিবেশ এখন সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত।

পেট্রল স্টোর-এর পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা ও সোহানা, গুহাটার শেষমাথার একটা কোণে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল ওরা। রানার পিঠে চাদর মোড়া

বান্ডিল, হাতে পানির ক্যান। বান্ডিলটা আসলে চৌকো একটা বিস্কিটের টিন, ভেতরে পলিথিনে জড়িয়ে রাখা হয়েছে আজ রাতে ওদের জন্যে বরাদ্দ করা সমস্ত খাবার। পলিথিনের ভাঁজ করা বড় একটা শীটও রয়েছে টিনের ভেতর, দু'দিন আগে প্রফেসর হোয়াইটস্টোনের বিছানা থেকে পেয়েছিল রানা। খোঁড়াখুঁড়ির প্রথম দিকে মাটি থেকে যে-সব মূল্যবান জিনিসের টুকরো-টাকরা পাওয়া গেছে সেগুলো সম্ভবত এই পলিথিনের শীটে রাখা হত।

সোহানা বইছে স্কাইয়ার আর পানির দুটো বোতল।

সেসনার শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে পরম স্বস্তি বোধ করেছে সোহানা, অবশেষে ভারী বোঝাটা নেমে গেছে ওর কাঁধ থেকে। এই বোঝাটা ওদের কাঁধে ছিল বলেই নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্যে বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে পারেনি ওরা, ও আর রানা। এখন আর কোন চিন্তা নেই। একা হয়ে গেছে ওরা।

ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই রেডিওর সাহায্যে ভিক্টর ক্যানিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পাইথন। সেজন্যেও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। সেসনা নিয়ে আলজিয়ার্সে যাচ্ছে না ওয়াটসন, যাচ্ছে তাঞ্জিয়ারে। আলজিয়ার্সে ভিক্টর ক্যানিঙের লোক অবশ্যই থাকবে, কিন্তু হতাশ হতে হবে তাদের। তাঞ্জিয়ার এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর লন্ডনে ফোন করবে আশরাফ, দু'জায়গায়। প্রথমে করবে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলোকে, তারপর রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়। মরক্কোর আইন মন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করবে আশরাফ। তাঞ্জিয়ারের একটা পাহাড়ে সোহানার ভিলা আছে, বছরের একটা সময় ওখানে ছুটি কাটায় ও। ওর দেয়া পার্টিতে প্রতি বছর আমন্ত্রিত হয়ে আসেন আইন মন্ত্রী। সোহানার বন্ধুই বলা যায় ভদ্রলোককে।

বিল ওয়াটসন, আশরাফ চৌধুরী, জেনি উডহাউস, প্রফেসর হোয়াইটস্টোন বা তাঁর আর্কিওলজিকাল টীম, কারুরই নাগাল পাবে না ভিক্টর ক্যানিং।

স্কাইয়ার ধরা হাতটা তীব্র ব্যথা করছে সোহানার, অপর হাতে ওয়াটসনের দেয়া ছোট একটা টর্চ। ট্রলির ওপর রাবারাইজড নাইলনের শীটটা বিছাল রানা। চারটে লম্বা কাঠের পোল বা থাম তোলা হলো ট্রলিতে, তারপর দুই প্রস্থ কুণ্ডলী পাকানো রশি ও পানির ক্যান।

স্টিয়ারিং টিলারটা ধরল রানা, সাবলীলভাবে চলতে শুরু করল ট্রলি। পাথুরে জমিনে প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না। পাঁচমেশালি ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়ায় সব মিলিয়ে ট্রলির ওজন মাত্র দুশো পাউন্ড। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে রানার পিছু পিছু হাঁটছে সোহানা। ট্রলিটাকে মাইলখানেক টেনে আনার পর থামল রানা। পাহাড়ের দীর্ঘ বাঁক ঘুরে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'এখানেই কাজটা সেরে ফেলি, সোহানা। খুব বেশি আওয়াজ করব না।'

'ঠিক আছে, রানা। এই হাত নিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারব না, তবু সাহায্য দরকার হলে বোলো।'

ফাঁকা প্রান্তরে ঝড়ের বেগে বইছে বাতাস, বাতাসের দিকে পিছন ফিরল ও। এখন ঠাণ্ডা লাগলেও, দিনের বেলা উত্তপ্ত তন্দুর হয়ে উঠবে এই প্রান্তর। উত্তর

দিকের পথটা কি রকম হবে কল্পনার চোখে দেখতে পেল সোহানা। সাহারার ওপর দিয়ে নিয়মিত দুটো পথ রয়েছে—নিনে দু হগার ও নিনে দু টানেজরুফট। প্রথমটা উত্তরদিকে এল গোলিয়া-র দিকে চলে গেছে—বলা যায় রূপকথার একটা রাজ্যে, বিশাল ঊষর মরুভূমির মাঝখানে এখানে-সেখানে ঝর্ণা ও ফুলের বিপুল সমারোহ সহ মরুদ্যান। এল গোলিয়া থেকে গারদাইয়া হয়ে সাহারা অ্যাটলাস, তারপর আলজিয়ার্স।

পশ্চিমের পথটা পুরোপুরি সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে দুশো মাইল এগিয়েছে, এধরনের প্রান্তরকে আরবরা বলে রেগ। পৌঁচেছে আদরার-এ, তারপর কলম্ব-বেচার হয়ে, পাহাড়-পবর্তের ভেতর দিয়ে ঢুকেছে মরক্কোয়। তিন ধরনের মরু নিয়ে সাহারা। নুড়ি ও কাঁকর ছড়ানো শুকনো সমতল অর্থাৎ রেগ। বালির বিশাল সাগর, বাতাসের চাপে বালিয়াড়ি বহুল চেহারা পেয়েছে, আরবরা বলে এর্গ। আর আছে পাথুরে বিস্তৃতি, গোলকধাঁধার মত পাহাড়ী নালা, স্থানীয় ভাষায় যেটাকে বলা হয় হাম্মাদা।

রেগুলার রুটগুলোর কোনটাই ধরবে না ওরা, কারণ ওদিকে ওদের জন্যে ফাঁদ পাতা হতে পারে। ভিক্টর ক্যানিঙের শক্তিশালী হাত কতদূর লম্বা ওদের তা জানা নেই, যথেষ্ট লম্বা হলে সরু দুই মরুপথে অচিরেই তার লোকজন ছড়িয়ে পড়বে। মরুপথে খুব দ্রুত খবর পৌঁছে যায়। পাঁচশো মাইলের মধ্যে থেকে একজোড়া মানুষকে খুঁজে বের করা বড় কোন সমস্যা নয়, বিশেষ করে যদি হেলিকপ্টার বা প্লেন ব্যবহার করা হয়।

রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পশ্চিমে যাবে ওরা। দেড়শো মাইল সমতল জমিন পেরিয়ে বালিয়াড়ি বহুল হাম্মাদা এলাকায় চলে যাবে। এ-ধরনের অভিযানে ভাগ্য সহায়তা করলে মরুভূমি সম্পর্কে অজ্ঞ একজন লোক খুব বেশি হলে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে। ঘাম ঝরে পড়তে না দেয়ার জন্যে সে তার শরীর ঢাকবে না, জানে না বালি থেকে কিভাবে পানি বের করতে হয়, গিরগিটি বা ঘৃণ্য কোন প্রাণী মেরে খাবে না, উটের প্রিয় ঘাসও তার মুখে রুচবে না, লবণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য একজন অপরজনের গা চাটবে না, নিজের বানানো তীর দিয়ে গ্যাজেল হরিণ মারবে না।

ওদের সঙ্গে বেশ ক'দিনের খাবার ও পানি আছে। একটা বাহনও আছে, এমনকি ছায়াও পাওয়া যাবে। ইচ্ছে করলে বসতে বা শুতে পারবে ওরা।

রানা বলল, 'এটা একবার ধরতে পারবে, সোহানা?' কাঠের একটা থাম, শেষ প্রান্তটা ধরল সোহানা। থামের মাঝখানটা ডেরিকের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধল রানা, বেস-এর ঠিক ওপরে। এরপর ট্রলির পিছনে চলে এল দু'জন, দ্বিতীয় থামের মাঝখানটা ছোট একটা রশি দিয়ে বাঁধা হলো, লম্বা মেটাল পাইপের ওপরের প্রান্তে গলিয়ে দিল একটা ঢিলে লূপ।

দশ মিনিট পর চৌকো বড় আকারের শীটটা ট্রলির ওপর বিছাল রানা, ওপর-নিচের দুই দিকের সারসার ফুটোয় রশি ঢোকাল, রশির প্রান্তগুলো জড়াল থাম দুটোর সঙ্গে। দ্রুত হাতে নিঃশব্দে কাজ করছে ও, কোন বিরতি ছাড়াই, যেন

কিভাবে কি করতে হবে আগেই সাজানো ছিল ওর মাথায়।

প্রতিটি বেস পোল-এর শেষ মাথা থেকে এক প্রস্থ করে রশি ঝুলছে, মুক্ত প্রান্তগুলো কুণ্ডলী পাকানো, পড়ে রয়েছে ট্রলির প্ল্যাটফর্মে। মূল কয়েল থেকে ছুরি দিয়ে ছোট করে রশি কাটল রানা। ইতিমধ্যে ওর কাজের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে সোহানা। মাথাটা আগুনের মত গরম লাগছে ওর, অথচ দু'এক মিনিট পরপর ঠাণ্ডা হিম স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে।

এক সময় রানা বলল, 'হয়েছে। এসো দেখা যাক, কাজ করে কিনা।' ট্রলিতে উঠে একটা রশিতে ঢিল দিল ও। ডেরিকের সরু মেটাল বাহু খাড়াভাবে সিধে হলো, ব্রেসিং বারগুলো লক করল রানা। ডেরিক বেস-এর কাছে পলিথিন শীট ও ক্রস-পোল দুটো লম্বা একটা বান্ডিলের মত পড়ে রয়েছে। সোহানাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করার জন্যে নিচের দিকে একটা হাত বাড়াল রানা।

ট্রলির পিছন দিকে সরে এল ও, গুড়ি মেরে বসল একটা বার-এর পাশে, প্ল্যাটফর্মের এক কি দু'ইঞ্চি ওপরে বেরিয়ে রয়েছে ওটা, গা থেকে ঝুলছে অনেকগুলো রশির প্রান্ত।

ডেরিকের মাথা থেকে পুলি সচল হবার আওয়াজ পেল সোহানা। মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠল বিরাট চৌকো পাল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ফুলে উঠল সেটা, চলতে শুরু করল ট্রলি। চিৎকার করে উঠল রানা, 'জেসাস! টিলারটা ধরো, সোহানা!'

শরীর লম্বা করে দিয়ে টিলারটা ধরল সোহানা, ছোট ফ্রন্ট হুইল ঘোরাল, ট্রলিটা যাতে সোজা একটা পথ ধরে এগোয়। ওর পিছনে খুশিতে আপনমনে কথা বলছে রানা, অনেকগুলো রশির প্রান্ত নিয়ে টানাটানি করছে। কোনটা ঢিল দিল একটু, কোনটা টানল, অদ্ভুতদর্শন পালটাকে নিখুঁত করার চেষ্টা, ঠিকমত যাতে বাতাস পায়।

অবশেষে রানার হাসির আওয়াজ পেল সোহানা। 'নির্ঘাত বারো নটে ছুটছি আমরা, সোহানা। বাহনটাকে তোমার কেমন লাগছে?'

'ভালই। তবে ওকে তোমার ধরতে হবে, রানা।' কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'টিলারটাকে বেঁধে ফেলো, যাতে খুব কম নড়ে। তাহলে বড় কোন ঝাঁকি খেলেও ঘুরবে না বা থামগুলো ভাঙবে না।'

'ঠিক আছে।' হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার পাশে চলে এল রানা, হাতে রশি। কাঁকর ও নুড়ি ছড়ানো জমিনের ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত ছুটছে ট্রলি। তেমন একটা ঝাঁকিও খাচ্ছে না। ভয় দমকা বাতাসকে, আর নজর রাখতে হবে কোর্স-এর দিকে। তাছাড়া আপাতত আর কোন চিন্তা নেই।

ভাগ্য খুব একটা খারাপ না হলে বাতাসটা টিকবে। ওরা জানে, মরুভূমির বাতাস একশো দিনে মাত্র ছ'দিন গতি হারায়। ধু-ধু প্রান্তরে কোন বাধা নেই, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। পরে অবশ্য এই শক্ত প্রান্তর থেকে বালিময় মরভূমিতে গিয়ে পড়বে ওরা, তবে সেখানে আরও ভালভাবে ছুটবে ওদের স্যান্ড-ইয়ট—যে-কোন লরি বা ট্রাকের চেয়ে ভালভাবে। ঝুরঝুরে আলগা বালিতে ট্রাকের চাকা পিছলে যায়। ওদের ট্রলির কোন ড্রাইভিং হুইল নেই,

এটাকে শক্তি যোগাচ্ছে পালটা।

টিলারটা আলগাভাবে বাঁধল রানা। 'কোর্স ঠিক আছে তো, সোহানা?'

'ঠিক আছে।' এটা একটা অদ্ভুত গুণ সোহানার। কম্পাস না থাক, আকাশে তারা না থাক, এমনকি চোখ বেঁধে দিলেও নির্ভুলভাবে দিক নির্ণয় করতে পারে ও।

হাত বাড়িয়ে ছুরিটা চেয়ে নিল, চোখ বুলাল আকাশে, প্ল্যাটফর্মের গায়ে তির্যক একটা রেখা তৈরি করল ফলার ডগা দিয়ে। 'রেখাটা পোল স্টার বরাবর রাখবে, তাহলে আর দিক হারাতে হবে না।'

মাথা ঝুঁকিয়ে আবার ট্রলির পিছন দিকে ফিরে এল রানা, পালটাকে অ্যাডজাস্ট করল। একটা চাদরের ভাঁজ খুলে ট্রলির ওপর বিছাল ও। 'তুমি শুয়ে পড়ো, সোহানা।'

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হলো না, শুয়ে পড়ল সোহানা। 'কোন কাজ থাকলে ডেকো আমাকে,' বলল ও।

'ডাকব। কেমন আছে হাতটা?'

'আছে।' চোখ বুজল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'কাজটা শেষ করা গেল না বলে খারাপ লাগছে, রানা। পাইথন আর পেনিফিদার সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে।'

'খারাপ আমারও লাগছে। কিন্তু আমাদের সাথে নিরীহ ও অনাড়ী অতগুলো লোক থাকায় ঝুঁকি নেয়া উচিত হত না। ওদেরকে নিয়ে সেসনা চলে যাবার পর অবশ্য একটা ঝুঁকি নিতে পারতাম আমি, কিন্তু তোমার হাতের কথা ভেবে সাহস পাইনি।'

'হ্যাঁ, ঝুঁকি নেয়া উচিত হত না।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। তারপর রানা বলল, 'তবে পাইথনের সাথে আবার আমার দেখা হবে, সোহানা। হয়তো আমিই ওকে খুঁজে বের করব। ব্যাপারটা যখন শুরু হয়েছে, এর শেষটা আমাকে দেখতে হবে। ভৌতিক একটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সোহানা?'

রানার কথা শুনতে পায়নি সোহানা, ঘুমিয়ে পড়েছে। কালো আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো, তরতর করে এগিয়ে চলেছে ওদের ট্রলি।

নয়

দ্বিতীয় দিন দুপুরের দিকে, মাস থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে পৌঁছে, ট্রলির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল ওদের। এর আগে, কাল রাতে, স্নাইযারটা হারিয়েছে ওরা। বেদুইন ডাকাতরা অতর্কিতে হামলা করেছিল, সাত-আটজনের দলটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে সবগুলো গুলি খরচ করতে হয়েছে রানাকে। পিছনে দুটো লাশ

রেখে গেছে তারা, আহত হয়েছে আরও তিনজন। রানার ভয় ছিল, আবার ওরা ফিরে আসবে। কিন্তু আসেনি।

বালিয়াড়ি শুরু হয়েছে, ট্রলিটাকে তবু টেনে আনতে হলো রানাকে। আট মাইল এগোতে সময় লাগল দু'ঘণ্টা। কাজেই এবার এটাকে বাদ দিতে হয়।

পানি আছে আর এক ক্যান, ক্যানটা পিঠে বেঁধে নিল রানা, ভাঁজ করা শীটটা থাকল ক্যান-এর ওপর। চাদর দিয়ে এক জোড়া আলখাল্লা মত বানিয়েছে রানা, পরে নিল দু'জনে, শরীরের ঘাম যাতে বাষ্প হয়ে উড়ে না যায়। স্লিং, ছুরি আর পাতলা পলিথিনটা নিল ও, বাকি সব ফেলে দিল।

এখান থেকে রওনা হয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল এগোবে ওরা, হাঁটবে শুধু রাতে, দিনের প্রচণ্ড গরমে বিশ্রাম নেবে। ফাটলবহুল পাথুরে জমিন ও শুকনো নালাবহুল হাম্মাদায় প্রচুর ছায়া পাবে ওরা, ছায়া পাবে বালিয়াড়ির নিচে। প্রয়োজনে পলিথিন শীট দিয়ে মাথার ওপরটা ঢাকা যাবে।

ভোরে থামল ওরা, সারা রাত হেঁটেছে। বালিতে একটা গর্ত করল রানা। মনটা খুশি থাকারই কথা, শুধু সোহানার হাতটা ওকে ভাবিয়ে তুলছে। বাহুটা ফুলতে শুরু করেছে, ক্ষতের চারপাশে লাল হয়ে উঠেছে চামড়া। ওর চোখ দুটো অতিরিক্ত চকচক করছে, তারমানে জ্বর আসছে। মরুভূমির দিনগুলো এত বেশি গরম যে ভাল ঘুম হবার কথা নয়, কিন্তু সোহানা একেবারেই ঘুমাতে পারছে না। লক্ষণটা ভাল ঠেকছে না রানার। ওর দিকে তাকাল একবার। চোখ বুজে ছটফট করছে, বারবার পাশ ফিরছে, তন্দ্রার মধ্যে বিড়বিড় করছে। ক্যাকটাসের লম্বা কাণ্ড খাড়া করে পলিথিনের শীটটা টাঙিয়েছে রানা, ছায়ার ভেতর শুয়ে রয়েছে সোহানা।

এক ঘণ্টা হলো গর্তটা খুঁড়ছে রানা। দৈর্ঘ্যে ওটা দশ ফুট হলো, ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, শেষ মাথার কাছে গভীরতা তিন ফুট। বিস্কিটের টিনটা খুলল ও, পলিথিন মোড়া খাবারগুলো বের করে ঢাকনির ওপর রাখল, খালি টিনটা নামিয়ে দিল গর্তের ভেতর। ছুরি দিয়ে কয়েকটা ক্যাকটাসের গা কাটল, টুকরোগুলো বসিয়ে দিল গর্তের ঢালু গায়ে, তারপর গর্তের ওপর চাপা দিল পলিথিন শীটটা। মাঝখানে খানিকটা ঝুলে পড়তে দিল ওটাকে। গর্তের কিনারায়, শীটের সবগুলো প্রান্তে, বালি চাপা দিল, তা না হলে গর্তের ভেতর পড়ে যেতে পারে ওটা। কয়েকটা নুড়ি পাথর রাখল মাঝখানে, মাঝখানটা যাতে আরেকটু নিচের দিকে ডেবে থাকে। কাজটা শেষ করে খুঁটিয়ে দেখল রানা, নিশ্চিত হলো পলিথিনটা নিচের টিন বা গর্তের পাশগুলো স্পর্শ করছে না। এরপর ছায়ায়, সোহানার পাশে ফিরে এল ও। চোখ বুজে এক এক করে দুশ্চিন্তাগুলো তাড়াল মন থেকে, শরীরের ব্যথা ও অস্বস্তি ভুলে যাবার চেষ্টা করল, ফলে ঘুম আসতে দেরি হলো না। মরুভূমিতে টিকে থাকতে হলে ঘুমের কোন বিকল্প নেই।

সারাটা দিন পলিথিন শীটের ভেতর দিয়ে রোদের তাপ নামল গর্তের নিচে, ক্যাকটাসের টুকরো ও ভেজা ভেজা বালি থেকে বাষ্প উঠল। বাষ্পগুলো জমাট বাঁধল পলিথিন শীটের উল্টোদিকে, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকল টিনে। সন্ধের

দিকে দুই কি তিন পাইন্ট পানি জমল ওটায়। খুব বেশি হয়তো নয়, তবে ওদের পানির সঞ্চয় খানিকটা বাড়ল বৈকি।

ধু-ধু মরু-প্রান্তরে রাত নামল। তারার মেলা বসল কালো আকাশে। পাশাপাশি শুয়ে ঘুমাচ্ছে ওরা।

পাঁচটনি ট্রাকের ওপরটা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। মালপত্রের ওপর ক্যানভাসের আবরণ, ফলে কাঠের বড় বাক্সগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কাঠের বাক্সগুলো ছাড়াও পেট্রল ও পানির ড্রাম তোলা হয়েছে ট্রাকে। ক্যাব-এর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইথন, হাতে একটা সিগার, বিশাল মুখটা শান্ত ও নির্লিপ্ত।

উপত্যকার মুখ থেকে হেঁটে এল পেনিফিদার। পাইথনের দিকে তাকাল সে, চোখ ও চেহারায় ব্যঙ্গ মেশানো তৃপ্তির ভাব। দানবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুলল, 'ঠিক আছে। এবার আমরা রওনা হতে পারি।'

সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল পাইথন। 'অবশ্যই। আলজিরিয়ান বন্ধুদের কি হবে?'

'ল্যান্ড রোভার দুটো নিতে বলেছি ওদেরকে। যেদিক খুশি চলে যাক। এই ট্রাক নিয়ে এল গোলিয়া পর্যন্ত যেতে পারবে তো তুমি?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

মিটিমিটি হাসল পেনিফিদার, চোখে কৌতুক। 'এখন আর তুমি ক্যানিং সাহেবের প্রিয়পাত্র নও। ব্যর্থ হবার পর কেমন লাগছে তোমার, পাইথন?'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি, আমি ব্যর্থ হয়েছি?' চুটকি মেরে সিগারের ছাই ঝাড়ল পাইথন, চেহারা আগের মতই নির্লিপ্ত। 'গুপ্তধন উদ্ধার করা হয়েছে, সেটা কার কৃতিত্ব?'

'কিন্তু ক্যানিং সাহেবকে বিপদে ফেলে দিয়েছ তুমি। রানা ও সোহানা মুখ খুলবে, কোন সন্দেহ নেই। হয়তো এই মুহূর্তে কথা বলছে তারা। ক্যানিং সাহেব অবশ্যই ফেঁসে যাবেন। আর সেজন্যে একা তুমি দায়ী।'

'হোয়াইটস্টোন আর তার দল যা-ই বলুক, ওগুলোর কোন অর্থ করা যাবে না। এখানে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, এ-সবের সাথে ভিক্টর ক্যানিংকে জড়ানো সম্ভব নয়। মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী মুখ খুলবে?' মাথা নাড়ল পাইথন। 'আমার তা বিশ্বাস হয় না। যে-কোন সমস্যা সমাধানের নিজস্ব পদ্ধতি আছে ওদের। আমার ধারণা, ওদের নিয়তি ওদেরকে আমার কাছে টেনে নিয়ে আসবে। তারমানে আমার অসমাপ্ত কাজটা আমি সমাপ্ত করার সুযোগ পাব। সত্যি যদি মুখ খোলার ইচ্ছে ওদের থাকত, ক্রুনেলের নোট-বুকটা নিয়ে যেত ওরা। বাকি থাকল বিল ওয়াটসন। তার পক্ষেও মুখ খোলা সম্ভব নয়, কারণ তাতে তার নিজের ভূমিকা ফাঁস হয়ে যাবে।' সামান্য হাসল পাইথন। 'আমার মনে হয় না ভিক্টর ক্যানিং কোন বিপদে পড়েছেন।'

'তা যদি না-ও পড়ে থাকেন, এরপর তিনি আর তোমাকে কোন কাজ দেবেন বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছেন, কাজের চেয়ে আনন্দ-

ফুর্তিকেই তুমি বেশি গুরুত্ব দাও।'

'আনন্দ-ফুর্তিই তো জীবন,' বলল পাইথন। 'আমি যে হাস্যরস ভালবাসি, তিনি জানেন। অভিযোগ করার সুযোগ আগে কখনও পানওনি। আমরা কি এবার যাব?'

ক্যাব-এর ভেতর তাকাল পেনিফিদার। 'ক্রুনেল কোথায়?'

চেহারায় অসন্তোষের ভাব, কাঁধ ঝাঁকাল পাইথন। 'নিচে। নোট-বুকে লেখার জন্যে সম্ভবত নাট-বল্টু গুনছে।'

ছয় চাকা ট্রাকের সামনে দিয়ে আরেক দিকে চলে এল পেনিফিদার। ট্রাকের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে ক্রুনেল, বাইরে শুধু বেরিয়ে আছে তার পা দুটো। কথা বলার জন্যে ঝুঁকল পেনিফিদার, কিন্তু গলায় আটকে গেল আওয়াজ, গলার ভেতরটা হঠাৎ করে ভয়ে শুকিয়ে গেল। ক্রুনেলের শুয়ে থাকার মধ্যে অস্বাভাবিক একটা স্থির ভাব রয়েছে, বুট পরা পা দুটো একবারও নড়ছে না।

সিধে হচ্ছে পেনিফিদার, জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে অস্ত্রটা ধরতে যাচ্ছে, এই সময় পিছন থেকে তার ঘাড়টা এক হাতে আঁকড়ে ধরল পাইথন।

ঠাণ্ডা চাঁদের আলোয় তিন রাত হাঁটল ওরা। দিনের বেলা ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে। অলস, আড়ষ্ট একটা ভঙ্গি এসে গেছে ওদের নড়াচড়ায়, প্রয়োজন না হলে কথা বলছে না।

দ্বিতীয় দিন একটু সুস্থবোধ করল সোহানা। তৃতীয় দিন অসুস্থতা বাড়ল। তারার ওপর সতর্ক চোখ রেখে দিক নির্ণয় করছে রানা।

চারদিনের দিন ভোর বেলা থামল ওরা, ধীরে ধীরে এক পাক ঘুরে ওদেরকে ঘিরে থাকা সীমাহীন প্রান্তরের সবগুলো দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল রানা। উত্তর-পশ্চিম দিকের একটা অংশ হাম্মাদা—কাত হয়ে থাকা মালভূমি ও গম্ভীরদর্শন পাথরের টাওয়ার জড়িয়ে আছে চক ও স্যান্ডস্টোনের সঙ্গে। দৃশ্যটার মধ্যে পরিচিত কি যেন একটা আছে বলে মনে হলো রানার। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে শুরু করল ও। তারপর মনে পড়ে গেল।

দুর্গ। প্রাচীন ফরাসী দুর্গ। আকারে ছোট, গোটা সাহারা জুড়ে এরকম অনেকগুলোই ছড়িয়ে আছে। আরবরা ওগুলোকে বরদিয়া বলে। মেইন ট্রান্স-সাহারান রুট ধরে যারা আসা-যাওয়া করে, এ-ধরনের পরিত্যক্ত দুর্গে আজও আশ্রয় নিতে পারে তারা। পরিত্যক্ত হলেও, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার প্রায় প্রতিটি দুর্গের জন্যে একজন করে পাহারাদার নিয়োগ করে, বিশেষ করে দুর্গটি যদি মরুপথের পাশে কোথাও থাকে।

বরদিয়া কেরিম। নামটা মনে পড়ল রানার। রেগুলার ক্যারাভান রুট থেকে অনেকটা দূরে নিঃসঙ্গ একটা আউটপোস্ট। চার বছর আগে দুর্গটায় হপ্তাখানেক থাকতে হয়েছিল ওকে। কপালে হাত রেখে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করল ও। মরুভূমিতে দূরত্ব আন্দাজ করা সহজ কাজ নয়, তবু বুঝতে পারল হাম্মাদার শেষ প্রান্তে নিচু পাহাড়শ্রেণীর কিনারায় কোথাও আছে দুর্গটা, এখান থেকে সাত-

আট মাইলের কম নয়।

আপনমনে হাসল রানা, তাকাল সোহানার দিকে। চাদরের ভাঁজ খুলছিল ও, কিন্তু এই মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাত মাথার মাঝখানে, নিজের চারদিকে কি যেন খুঁজছে ব্যাকুলদৃষ্টিতে। রানা ওর দিকে ফিরতেই জানতে চাইল, 'আশরাফ কোথায় গেছে বলো তো? আর জেনি?'

তলপেটের ভেতর ভয় যেন সাপের মত মোচড় খেল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সোহানার অক্ষত হাতটা ধরে ফেলল রানা। কথা বলল স্বাভাবিক সুরে, 'ওরা ভাল আছে, সোহানা। আমাদের আগে চলে গেছে ওরা। এবার তোমার হাতটা একটু দেখি।'

'না, দরকার নেই, আমার হাত ভাল আছে,' খিটখিটে গলায় বলল সোহানা, যেন খুব বিরক্তি বোধ করছে। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন, মনে হলো ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না।

'ভাল থাকলে তো ভালই, দেখলে ক্ষতি কি। কই, দাও।' সামান্য বাধা দিল সোহানা, ওকে বসাবার জন্যে একটু জোর খাটাতে হলো রানাকে। এই প্রথম অবাক হয়ে উপলব্ধি করল, অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছে সোহানা। পায়ের সামনে, জমিনের ওপর তাকিয়ে থাকল, রানাকে ওর কাজে বাধা দিল না। আলখেল্লা খুলে সরিয়ে রাখল রানা, তারপর শার্টের বোতামগুলো খুলল। আস্তিনটা কব্জি থেকে নামাবার সময় দু'বার ব্যথায় শিউরে উঠল সোহানা।

তাকিয়ে থাকল রানা, আশঙ্কায় ধক ধক করছে বুকের ভেতরটা। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত ফুলে ঢোল হয়ে আছে হাতটা। ব্যান্ডেজের নিচে ফোলা মাংস প্রায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। শার্ট আর আলখেল্লা আবার পরিয়ে দিল ওকে। 'তোমার এই হাতটার যত্ন নিতে হবে, সোহানা।'

ভোঁতা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ও। মাথা ঝাঁকাল।

'কাছাকাছি একটা দুর্গ আছে। পৌঁছুতে দু'তিন ঘণ্টা লাগবে। ওখানে পানি পাব আমরা, আশ্রয় পাব।'

আশ্রয় অবশ্যই পাওয়া যাবে, আজও যদি দুর্গটা খাড়া থাকে। পানিও পাওয়া যাবে, কুয়াটা যদি শুকিয়ে গিয়ে না থাকে। মরুপথ থেকে এতটা দূরে দুর্গটায় কোন পাহারাদার থাকবে বলে আশা করা যায় না।

নির্দয় রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। পানির ক্যান, চাদর, খাবার ইত্যাদি শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে রানা। সোহানার অক্ষত হাতটা ধরে রেখেছে। রানার গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে রয়েছে ও। পা ফেলছে এলোমেলো, অন্ধের মত। হোঁচট খাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

ভাগ্য ভাল, দুর্গটা আজও ভেঙে পড়েনি। দীর্ঘ ঢালের মাথা থেকে নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল রানা। ত্রিশ মিনিট পর গেটের ভেতর উঠানে ঢুকল ও সোহানাকে নিয়ে। গেট বলতে ভাঙা ইঁটের স্তূপ, দু'পাশে পাঁচিলের কোন অস্তিত্ব নেই। পাঁচিল ভেঙে ইঁটগুলো নিয়ে গেছে আরব বেদুইনরা। রানা ধারণা করল, দুর্গের ভেতরও কাজে লাগতে পারে এমন কিছু পাওয়া যাবে না।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, সবই আছে, আবার কিছুই নেই। ওর সরাসরি সামনে, উঠানের মাঝখানে দু'তলা ভবন, তার পাশে সিঁড়ি, উঠে গেছে দুর্গের ছাদে। উঠানের দু'পাশে নিচু দু'সারি ব্যারাকরুম, অ্যামুনিশন স্টোর, আস্তাবল আর অফিসার্স কোয়ার্টার। সবই আছে, কিন্তু কোন কাঠ বা লোহার চিহ্নমাত্র নেই। একটা ঘরেরও দরজা দেখা যাচ্ছে না। ক্ষতবিক্ষত ইঁটের ও পাথরের গাঁথুনি ছাড়া আর কিছুই নেই।

শরীরে বাঁধা জিনিসগুলো এক এক করে নামাল রানা। সোহানাকে বুকে তুলে নিয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারে চলে এল। ডান দিকে ঘুরে যাওয়া মোটা পাঁচিলের এক ধারে ছোট্ট একটা কামরা, ছায়ার ভেতর। কামরাটা তৈরি করা হয়েছিল মাটির অনেকটা নিচে থেকে, যাতে গরম কম লাগে। একই কোণে ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা একটা ঘর রয়েছে, ভেতরে কুয়া। ঘরটার কাঠের ছাদ অদৃশ্য হয়েছে।

কুয়াটা পঞ্চাশ ফুট গভীর, পাথর ভেদ করে নেমে গেছে সোজা। নিচে পানির একটা স্রোত আছে, হাম্মাদা এলাকা থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। বেদুইনরা কাঠের মোটা তক্তাটা নিয়ে যায়নি, কুয়ার ওপর পড়ে রয়েছে সেটা। ওই ঢাকনি না থাকলে বালিতে ভরে যেত ভেতরটা।

কুয়ার সামনে কয়েক ফুট জায়গা জুড়ে কিছু মরু ঝোপ দেখা গেল। চার বছর আগে ওখানে খুদে একটা গোলাপ বাগান দেখেছিল রানা। সৌখিন কোন লোক দীর্ঘদিন ছিল হয়তো এখানে, বেদুইন শ্রমিকদের দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলিয়ে গোলাপ গাছের গোড়ায় ঢালত। গোলাপ গাছগুলোর আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই, তবু জায়গাটা একটু ভেজা ভেজা হয়ে আছে, আধ ফুট লম্বা ঝোপ জন্মেছে কয়েকটা। তেতো আপেলের একটা গাছও দেখতে পেল রানা, পাশেই একটা শশা ও থালা গাছ।

রানার নির্বাচিত কামরাটা প্যাসেজের শেষ মাথায়, কয়েকটা ধাপ বেয়ে নামতে হয়। এই কামরার ওপর আরও দুটো ঘর আছে। ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা লাগল। কামরার একদিকের দেয়ালে লম্বা একটা গর্ত, আলোর কোন অভাব নেই। এককালে ওটা একটা জানালা ছিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল সোহানা। নরম বালির ওপর একটা কম্বল বিছাল রানা। বলতেই বাধ্য মেয়ের মত সেটার ওপর শুয়ে পড়ল সোহানা। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে কুয়াটা পরীক্ষা করল রানা। ছোট একটা পাথর ফেলল নিচে, ছলকে ওঠা পানির শব্দ পেল। প্রয়োজন হলে পানি তোলার ব্যবস্থা করা যাবে, আপাতত ক্যানের পানি খরচ হোক। ঘরে ফিরে এসে পাথর আর ছুরি ঘষে আগুন জ্বালল ও, টিনে পানি ফোটাতে শুরু করল। শার্টটা ছিঁড়ে অর্ধেকের বেশি ছেড়ে দিল ফুটন্ত পানিতে।

আবার কুয়ার কাছে ফিরে এল রানা। একটা ঝোপের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ল। এই পাতা বেটে উটের ক্ষতস্থানে বেদুইনদের লাগাতে দেখেছে ও। জীবাণুমুক্ত তো করেই, ক্ষতগুলো সেরেও ওঠে দ্রুত।

পলিথিনে মোড়া অল্প কয়েকটা বিস্কিট এখনও আছে। তবে শুকিয়ে শক্ত হয়ে

গেছে সবগুলো। পানিতে ভিজিয়ে নরম করল। দশ মিনিট পর রশি বাঁধা গরম টিন নিয়ে সোহানার পাশে চলে এল রানা। চোখ মেলে তাকাল ও। জ্বরে লাল হয়ে আছে চোখ দুটো। মুখের ফর্সা রঙও টকটক করছে। 'কেমন আছ, রানা?' দুর্বলকণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'তুমি কেমন আছ, সোহানা?' গরম পানিতে ভিজিয়ে ওর হাতের ব্যান্ডেজটা খুলতে শুরু করল রানা। ফুলে ওঠা অংশের মাঝখানে হলুদ পুঁজ দেখে দম বন্ধ করল। জোর করে হাসল ও। 'মন্দ নয়। সামান্য একটু ব্যথা পাবে, সোহানা।'

'তুমি? আমাকে? ব্যথা দেবে?' দুর্বল হাসি ফুটল সোহানার ঠোঁটে। 'দাও!'

সদ্য শান দেয়া জীবাণুমুক্ত ছুরিটা ফুটন্ত টিনের পানি থেকে তুলল রানা। এটা তৃতীয়বার গরম করা পানি, দ্বিতীয়বার ফোটানো পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়েছে ও। ছুরির ডগা দিয়ে ক্ষতের ফুলে ওঠা চারপাশটা ছ'জায়গায় ছোট করে কাটল, তারপর মাঝখানটা কাটল একটু বড় করে। সোহানা নড়ল না, কথাও বলল না; প্রতিক্রিয়া বলতে ওর চোখে শুধু অকস্মাৎ একটা শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল। কাপড় দিয়ে পুঁজ মুছল রানা, পরিষ্কার করল মুখগুলো, তারপর আবার চাপ দিয়ে পুঁজ ও রক্ত বের করল। ক্ষতের ভেতরটা যতক্ষণ না পুরোপুরি পরিষ্কার হলো, থামল না ও।

এক সময় আর পুঁজ বেরুল না, চাপ দিতে শুধু হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। 'হাতটা নেড়ো না, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল সোহানা।

কেটে আনা ঝোপের পাতাগুলো বেটে আগেই পেস্ট তৈরি করে রেখেছে রানা। ক্ষতের ওপর সেটা লেপে দিল, তার ওপর বসিয়ে দিল কাদা হয়ে ওঠা বিস্কিট। ব্যান্ডেজ বাঁধার সময়ও এক চুল নড়ল না সোহানা। যতক্ষণ বিস্কিট থাকবে, দু'ঘন্টা পর পর পুলটিসটা পাল্টে দিতে পারবে রানা। ও জানে, সোহানার শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কম নয়, ভেষজ রসটুকু ক্ষতটাকে জীবাণুমুক্ত করতে সাহায্য করবে। আশা করা যায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কট কেটে যাবে। বলল, 'তোমাকে প্রচুর পানি খেতে হবে, সোহানা। আছেও প্রচুর—কুয়াটায় এখনও হাত দিইনি।'

'ঠিক আছে।'

ওর মাথাটা কোলে তুলে নিল রানা, বোতল ভরা পানি ধরল মুখে। একটু একটু করে খেল সোহানা। 'লক্ষ্মী মেয়ে, এবার তুমি ঘুমোবে।' কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে শুইয়ে দিল ওকে রানা।

চোখ বুজল সোহানা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কিছুক্ষণ পর উঠল ও, উঠানে বেরিয়ে এসে একটা চাদর ছিঁড়ে পাকাল, টিনটাকে কুয়ায় নামাতে হবে।

পরদিন ভোর হবার এক ঘণ্টা বাকি থাকতে রানা উপলব্ধি করল, সোহানার বিপদ কেটে গেছে। ক্ষতের চারপাশটা এখন আর আগের মত ফুলে নেই, চামড়াও এখন আগের মত লাল নয়। তবে জ্বরটা আছে, যদিও ঘুমাতে পারছে ও।

রানা জানে, ঘুম ভাঙার পর অসম্ভব দুর্বল লাগবে নিজেকে সোহানার। তবে সেটাও তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবে ও। ওর শরীরে দ্রুত আরোগ্যলাভের শক্তি প্রচুর। সংক্রমণ ঠেকানো গেছে, কাজেই ওদের সামনে আর কোন বাধা নেই।

এখন প্রথম কাজ খাবার সংগ্রহ করা। এটা রানার জন্যে কোন সমস্যা নয়। যেভাবে হোক যোগাড় করবে। মাত্র দু'দিন পরই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে সোহানা। চারদিনের দিন আবার হাঁটতে পারবে আগের মত।

সারা রাত জেগে থাকায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। তবে মনে দুশ্চিন্তা না থাকায় ক্লান্তিটুকু উপভোগ্য লাগছে ওর। ভোর হবার খানিক পরই ঘুম ভাঙল সোহানার, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। গলাটা দুর্বল শোনাল, তবে প্রলাপ বকছে না। 'রানা, তোমাকে আমি খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম, না?'

'একটু। হাতটা কেমন লাগছে?'

হাতটা সামান্য একটু নাড়ল সোহানা, মৃদু হাসল। 'ভালই তো মনে হচ্ছে। তবে কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করছি। আমরা কোথায় বলো তো?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তোমার জন্যে একটা দুর্গ বানিয়েছি আমি, তবে দরজা-জানালাগুলো এখনও লাগানো হয়নি। শুধু তোমার আর আমার জন্যে বানিয়েছি। আছিও শুধু আমরা দু'জন। পানির কোন অভাব নেই। আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, চোখ বুজল। কুয়ার কাছে চলে এল রানা, পানি তুলতে হবে। নিজেকে তিরস্কার করল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে সোহানাকে পানি খাওয়াতে ভুলে গেছে।

খানিক পর গোসল করে স্ল্যাকস আর বুট পরল রানা, শার্ট না থাকায় খালি গায়ে দুর্গের ভেতরটা ভাল করে ঘুরে দেখার জন্যে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। দুর্গের মাথায় উঠে এসে পাথরবহুল হাম্মাদার দিকে তাকাল, ওদিকটাতেই যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। মরুভূমিতেও প্রাণীরা বসবাস করে, শুধু গিরগিটি বা ইঁদুর নয়, পাখি থেকে শুরু করে হরিণ পর্যন্ত অনেক কিছু পাওয়া যায়।

ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল রানা। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় ঢুকল, আশা, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু যদি পাওয়া যায়। পুরানো একটা চটের বস্তা পেলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাবে ও, শার্টের বদলে কাজ চালানো যাবে। খুশি হবে একটা বালতি পেলেও, কারণ বিস্কিটের টিনটা ফুটো হতে শুরু করেছে। মাটির তলায় পানির জন্যে ফাঁদ পাততে হলে একটা কিছু দরকার।

কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। লম্বা ব্যারাকরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, অফিসার্স কোয়ার্টারের দিকে হাঁটছে। বেশি বেলা হয়নি, সম্ভবত দশটা বাজে। ঘুম পাচ্ছে ওর, শুতে পারলে মন্দ হয় না। সন্ধের আগে হাম্মাদা থেকে ঘুরে আসা যাবে একবার।

কুয়া থেকে বিশ পা দূরে রানা, এই সময় পাইথনের ভরাট, সকৌতুক কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করল ওকে। 'তাহলে আবার আমাদের দেখা হলো। বেশ নাটকীয় একটা সংলাপ, কি বলো, মাসুদ রানা?'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। উঠনের একধারে, একটা পাথুরে বেঞ্চের ওপর বসে রয়েছে দৈত্যটা। পরনে স্ল্যাকস ও শার্ট, তবে মাথায় হ্যাট নেই। তার বুটে ধুলো থাকলেও, কোথাও ছেঁড়েনি।

ভেবে লাভ নেই দানবটা কিভাবে এখানে এল। এসেছে, এটাই বড় কথা। খালি গা, হাতে কোন অস্ত্র নেই, শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। হতাশা বিশাল একটা ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে ওর সমগ্র অস্তিত্বে।

'তাহলে তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে ওরা?' হাসল পাইথন। 'তখুনি আমার বোঝা উচিত ছিল, অবশ্যই। ওদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে ভারি। এমনকি আমাদের অন্যতম সেরা পাইলট ওয়াটসনের পক্ষেও জাদু দেখানো সম্ভব নয়।' চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। 'খুবই অস্বস্তিবোধ করেছিলাম, পরদিন যখন ট্রলিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ওটা নিয়ে কি করেছ তুমি, মাসুদ রানা?'

রানা কথা বলল না। ক্ষীণ একটা আশার আলো জ্বলে উঠেছে ওর মনের এক কোণে। পাইথন ওকে একা পেয়েছে এখানে, ধরে নিয়েছে ওর সঙ্গে আর কেউ নেই। সেটাই স্বাভাবিক। আহত অবস্থায় সোহানা মরুভূমি পাড়ি দেবে, এটা কেউ আশা করতে পারে না, যদি না কোন বিকল্প থাকে।

পাইথনের জানার কথা নয়, আর কোন বিকল্প ছিল না।

'লাজুক ছেলেদের মত চুপ করে থেকো না,' বলল পাইথন। 'অন্তত এই কারণে তোমাকে আমি শাসন করব না। কি করেছ ট্রলিটা নিয়ে?'

'ওটাকে আমি স্যান্ড-ইয়ট বানিয়েছিলাম,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আইডিয়াটা সোহানার। দশ দিনের হাঁটা পথ চব্বিশ ঘণ্টায় পেরিয়ে এসেছি।'

দামী পাথরের মত জ্বলজ্বল করে উঠল পাইথনের চোখ, হাসির দমকে কাঁপতে লাগল শরীরটা। 'তোমার বান্ধবী খুব চালাক। পরের বার আরও সাবধান হব আমি।' আবার ঘড়ি দেখল সে। 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমার সময় খুব কম। কাজেই তোমার পিছনে খুব বেশি ব্যয় করতে পারব না। তবু, যতটুকু আছে, এসো দু'জন মিলে তার স্বাদ গ্রহণ করি। ভাবছি, কি সুবর্ণ ক্ষণেই না এখানটায় আমার থামতে ইচ্ছে করেছিল। অবশ্য পেনিফিদারকে বলছিলাম, তোমার নিয়তিই তোমাকে আমার কাছে টেনে আনবে। ঘটেছে অবশ্য উল্টোটা—তোমার নিয়তি আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে। আশ্চর্য, কেন থামলাম আমি? এই দুর্গের তেমন কোন আর্কিওলজিকাল মেরিট নেই…' খোশ-গল্পের মেজাজে বকবক করে চলেছে সে।

আশার আলোটা বড় হচ্ছে রানার মনে। পাইথনের তাড়া আছে, দেখে মনে হচ্ছে সঙ্গে আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে না সে। দুর্গের বাইরে কোথাও একটা ট্রাক আছে। কিন্তু যদি ট্রাক নিয়ে এসে থাকে, শব্দ হয়নি কেন? প্রশ্নটা কঠিন নয়। মরুভূমিতে চলার সময় ড্রাইভার তার এঞ্জিনের যত্ন নেয়, বিশেষ করে রেডিয়েটর-এর। পার্ক করার সময় বনেট রাখে বাতাসের দিকে। ঢাল বেয়ে নামার সময় বন্ধ করে দেয় এঞ্জিন। দুর্গে পৌঁছুতে হলে দীর্ঘ

একটা ঢাল বেয়ে নামতে হয়। ট্রাকটা নেমে এসেছে নিঃশব্দে।

একটু পরই অসমাপ্ত কাজটায় হাত দেবে পাইথন, জানে রানা। শুরু করেছিল দশ বছর আগে, শেষ করবে সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এই নির্জন খাঁ-খাঁ মরুতে। লড়বে ওরা। কিন্তু আসলে কি সেটাকে লড়াই বলা যাবে?

পাইথনের সঙ্গে পারার কথা রানা ভাবে না। যা সম্ভব নয়, বাস্তব নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। দানবটা ওর সঙ্গে লড়বে না, ওকে নিয়ে খেলবে। তার শরীরে দশজন লোকের শক্তি ধরে, কিংবা হয়তো আরও বেশি, ওকে অনায়াসে খুন করবে সে। তারপর ট্রাক নিয়ে চলে যাবে পাইথন। সময়ের অভাব, পরিত্যক্ত একটা দুর্গ ঘুরেফিরে দেখতে চাইবে না।

সোহানাকে পাবে না সে।

প্যাসেজের শেষ মাথায়, যে কামরায় ঘুমাচ্ছে সোহানা, ওর হাতের নাগালের মধ্যেই আছে ক্যান ভর্তি পানি আর অল্প কিছু খাবার। সোহানার জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট। ধীরে ধীরে, দু'চারদিনের মধ্যেই, নিজের শক্তি ফিরে পাবে ও। অস্তিত্ব রক্ষা করবে।

রানা জানতে চাইল, 'পেনিফিদার কোথায়?'

বকবক করছিল পাইথন, হঠাৎ থেমে ভুরু কোঁচকাল। 'মহান পেনিফিদার আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্রুনেল জীবনের বোঝা থেকে মুক্তিলাভ করেছে,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'কেউ কেউ ভেবেছিল অপরপ্রান্তে ওদের জন্যে রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু আমি আমার অন্নদাতার সাথে একান্তে আলাপ করেছি, তাঁকে বুঝিয়েছি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত। সে যাই হোক, তুমি আমাকে মাঝপথে বাধা দিয়েছ, রানা। এমন হতে পারে, এমন হওয়া কি সত্যি সম্ভব যে তোমাকে আমি যা মনে করিয়ে দিতে চাইছিলাম তার কিছুই তুমি শোননি?'

রানা কথা বলল না।

দাঁড়াল পাইথন, তার বিশাল দুই হাত ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। 'আমার মুখ-নিঃসৃত মধুর বচন তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, বোঝা গেল। কিন্তু তোমাকে তো বলেইছি, আমার হাতে সময় কম। এদিকে আমার পা দুটো নিশপিশ করছে তোমার পাঁজরগুলো ভাঙার জন্যে। তোমাকে আমি বলেছি, হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে ভালবাসি আমি? বলিনি…?' হঠাৎ থেমে গেল সে, রানাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে সরে গেল তার দৃষ্টি, চোখ দুটো সামান্য বড় হয়ে উঠল। 'দেখা যাচ্ছে,' উল্লাসে অধীর শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'মাসুদ রানা একা নয়, সাথে সোহানা চৌধুরীও আছে। রানা, সত্যি খুশি হলাম। কারণ, দেখা যাচ্ছে, আমার ভয়ে তুমি বুদ্ধি হারাওনি। তোমার মাথাটা কাজ করছে। তুমি আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছ। আশা করি, যতটুকুই শক্তি রাখো, পারো আর না পারো, অন্তত আমার সাথে লড়তে চেষ্টা করবে তুমি!'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, হতাশা ও প্রচণ্ড রাগে অসুস্থবোধ করল। প্যাসেজের শেষ মাথায়, দরজার বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে

এসেছে সোহানা, বিশ গজ দূরে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো বড় বড়। সোহানার গায়ে শার্ট নেই, বাহুর ব্যান্ডেজটা দেখা যাচ্ছে। একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে কিভাবে ওর ঘুম ভাঙল। সম্ভবত জানালা দিয়ে পাইথনের গলার আওয়াজ পেয়েছে ও, ধাপ ক'টা টপকে উঠে এসেছে, দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে প্যাসেজে।

রানা বা পাইথন, কেউ নড়ল না। ধীরে ধীরে, অনেক কষ্টে, দরজার পাশে হেলান দিয়ে বসল সোহানা, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, হাত দুটো কোলের ওপর। সমস্ত শক্তি এক করে গলায় জোর আনার চেষ্টা করল ও, বলল, 'এবার তোমাকে জিততে হবে, রানা।'

হেসে উঠল পাইথন। রানার অস্তিত্বের গভীরে হিংস্র একটা পশু গর্জে উঠল, ওর চেহারা হয়ে উঠল আশ্চর্য শান্ত। হঠাৎ মাথার ভেতরটা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের কথা ভাবছে না ও। ভাবছে সোহানার কথা। ওকে বাঁচাতে হবে।

বেশ। তাই হোক।

পাইথনের কাছাকাছি হওয়া মানে আত্মহত্যা করা। তার নাগালের মধ্যে কোনভাবেই যাওয়া চলবে না। গরিলার হাত দুটো অসম্ভব ক্ষিপ্র। ওই হাতে একবার যদি শক্ত করে ধরতে পারে সে, মাসুদ রানা স্রেফ মারা যাবে। হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, কিভাবে ওগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে থাকা যায়? ওই হাতে একবার যদি ধরা পড়ে ও···।

হ্যাঁ, হাত দুটো। হ্যাঁ।

ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে শুরু করল রানা, শরীরটা ঝুঁকে আছে, হাত দুটো সামনে বাড়ানো। হাসল পাইথন, যেন বাচ্চা একটা ছেলের খেলা দেখছে। সে-ও হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল, একটু নিচের দিকে রাখল ওগুলো, তলপেটের নিচের অংশটা সুরক্ষিত করার জন্যে। তার হাতের আঙুল ছড়িয়ে আছে, লোহার আঙটার মত বাঁকানো।

অ্যাক্রোব্যাটদের প্রিয় একটা মুভ হলো নিতম্বে ভর দিয়ে শরীরটাকে চরকির মত ঘোরানো। দূরত্বটা মেপে নিল রানা, তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। শরীরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল, শূন্যে ডিগবাজি খেল একটা, ঘুরে গেল, ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লম্বা হলো পা, পাইথনের ডান হাতে আঘাত করল বুট, সেই একই মুহূর্তে মাটিতে তালু ঠেকিয়ে শরীরটা আবার ঘোরাল ও, নাগালের অনেক বাইরে সরে এল।

রশির মাথায় বাঁধা ভারি পাথরের মত বুটটা আঘাত করছে পাইথনের হাতে, হাড় ভাঙার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা। এখনও হাসছে পাইথন, তবে সামান্য হলেও আড়ষ্ট সেটা। হাতটা ঝাড়া দিল সে, যেন কোন অনুভূতি আছে কিনা পরীক্ষা করল। তারপর আবার সামনে বাড়তে শুরু করল, এবার আগের চেয়ে দ্রুত।

আবার হাতের ওপর ভর দিয়ে জোড়া পা ছুঁড়ল রানা। ঝট করে হাত দুটো বুকের কাছে টেনে নিল পাইথন। জমিনে ড্রপ খেয়ে শূন্যে উঠল রানা, দুই পা এক করে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ল—মাথায় নয়, পাইথনের হাতে। চওড়া বুকের সঙ্গে সেঁটে

থাকা মোটা হাত দুটো থেঁতলে দিল।

হোঁচট খেয়ে এক পা পিছু হটল পাইথন, তবে দাঁড়িয়ে থাকল সিধে হয়ে। অন্য কেউ হলে ছিটকে পড়ত মাটিতে।

এত দূর থেকেও হাড় ভাঙার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সোহানা। ওর শরীরে শক্তি বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, রানাকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারবে না। ক্রল করে দিনের আলোতে বেরিয়ে আসার আগে ঝাপসা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়েছে রানার ছুরিটা দেখতে পাবার জন্যে, কিন্তু খোঁজার মত সময় ছিল না। পেলেও কোন কাজে আসত বলে মনে হয় না, রানার দিকে ছুঁড়ে দিতে পারত না।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড হলো শুরু হয়েছে ওদের লড়াই, তবু প্যাটার্নটা ধরতে পারছে সোহানা। পাইথনের হাত দুটো অকেজো করতে চাইছে রানা। কৌশল হিসেবে খুবই কঠিন, লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ ও অসম্ভব ক্ষিপ্র একজন ফাইটারের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব শুধু। এরইমধ্যে প্রতিপক্ষের খানিকটা ক্ষতি করেছে বটে রানা, তবে তারমানে এই নয় যে সুবিধেজনক অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছে। দু'জনের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য আনতে হলে পাইথনের আরও অনেক ক্ষতি করতে হবে রানাকে। তবে একই পদ্ধতিতে তাকে দু'বার বোকা বানান যাবে না। নতুন কোন অপ্রত্যাশিত কৌশলে কাজটা করতে হবে রানাকে। দানবের ওই বিশাল হাত দুটোকে আঘাত করতে হবে, একই সঙ্গে দূরে সরে থাকতে হবে ওগুলোর মুঠো থেকে।

দুজনেই ঘুরছে ওরা, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। রানার ঘোরার গতি বাড়ল, মনে হলো পিছলে গেলো। শরীরের নিচে থেকে ছিটকে গেল পা, জমিনে পিঠ দিয়ে পড়ল ও। সামনে ও নিচের দিকে লাফ দিল পাইথন। রানার পায়ে দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ খেলে গেল, প্রতিপক্ষের তলপেটের নিচেটা ওর লক্ষ্য। দানবের প্রকাণ্ড হাত দ্রুত উরুসন্ধি আড়াল করল। কিন্তু রানার লাথিটা ছিল অসময়োচিত, আড়ষ্ট ও স্রেফ একটা ভান, আসল লাথিটা এল আধ সেকেন্ড পরে, আড়াআড়ি দুই হাতের ওপর, পাইথনের ডান হাতের আঙুলগুলো থেঁতলে দিল রানার গোড়ালি। সাবলীল গড়ান দিয়ে এক লাফে সিধে হলো রানা, সরে এল নাগালের বাইরে।

লড়াইটা কুৎসিত হয়ে উঠছে। দু'জন মানুষ যখন খালি হাতে পরস্পরকে খুন করার চেষ্টা করে, ব্যাপারটা কুৎসিত না হয়ে পারে না। পাইথন তার হাত দুটোকে মুগুর হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। আক্রমণ বন্ধ করে ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, ঠেকাচ্ছে বুট দিয়ে, সংঘর্ষে প্রচণ্ডতা আনার জন্যে একা শুধু পাইথনকে শক্তি ব্যয় করতে দিচ্ছে।

কিন্তু একবার একটা মুগুরের বাড়ি ঘষা খেল ওর কাঁধে, চোখের পলকে পড়ে গেল রানা। ওই অতিকায় শরীর নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে লাথি মারার জন্যে লাফ দিল পাইথন। এখন ওটাকে ঠেকাতে যাওয়া মানে হাত ভাঙার ঝুঁকি নেয়া, তার বদলে লাথিটা শরীরে গ্রহণ করল রানা, তবে গ্রহণ করল দ্রুত গড়াতে শুরু করে, ফলে পিঠের খানিকটা চামড়া উঠে গেলেও কোন হাড় ভাঙল না।

আরেকবার রানার জন্যে চমৎকার একটা ফাঁদ পাতল পাইথন। ওকে নাগালের মধ্যে পাবার জন্যে হঠাৎ ঘুরে সোহানার দিকে ছুটল সে। হিংস্র চিতার মত আকাশ থেকে তার পিঠে নামল রানা, হাঁটু ভাঁজ করা, আঙুল ডেবে গেল ব-দ্বীপ আকৃতির পেশীতে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে একটা হাত আনল পাইথন রানাকে ধরার জন্যে, এক হাতে তাকে ধরে থেকে অপর হাতের কিনারা দিয়ে পাইথনের আঙুলগুলোয় আঘাত করল রানা, বারবার, যতক্ষণ না ব্যথা ও আক্রোশে গর্জে উঠল পাইথন। পিছন দিকে লাফ দিল সে, মাটিতে আছাড় খাবে, শরীরের ভারে পিষে ফেলবে রানাকে। জমিন আর পাইথনের মাঝখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, মাটিতে পড়ল উবু হয়ে, পাইথন সিধে হতেই আবার তার হাতে লাথি মারল।

লড়াই যতই দীর্ঘ হচ্ছে, দু'জনের গতিবিধি সম্পর্কে ততই ঝাপসা হয়ে আসছে সোহানার ধারণা। লড়াই হচ্ছে একটা গরিলার সঙ্গে মানুষের। কমব্যাট টেকনিক খুব কমই জানে পাইথন, এ-সব তার কখনও প্রয়োজনও হয়নি। স্রেফ তার শক্তিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে এতদিন। কোন মানুষ একটা গরিলার হাত বা ঘাড় মোচড় দিয়ে ভাঙতে পারে না, কারাতের কোন মার দিয়েও তাকে কাবু করা সম্ভব নয়, উচিত নয় তার নাগালের মধ্যে যাবার সাহস করা।

যে পদ্ধতিটা রানা বেছে নিয়েছে, সেটা থেকে সুফল পেতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে ওকে চুলচেরা হিসেব করে। ওর শরীরে লাল লম্বা একটা রক্তের ধারা গড়াতে শুরু করেছে, আরেক জায়গার চামড়া ফুলে উঠে গোলাপি হয়ে গেছে। ওই দু'জায়গায় পাইথনের আঙুল ও মুঠো শুধু ঘষা খেয়েছে, ঠিকমত লাগেনি। ঠিকমত লাগল না, এরকম আঘাত একের পর এক অনেকগুলো সহ্য করতে হলো রানাকে। এই লড়াই যে কখন শেষ হবে, কেউ বলতে পারে না। কারণ শেষ করার জন্যে রানাকে নাগালের মধ্যে পেতে হবে পাইথনকে, কিন্তু রানা তার হাতে ধরা দেবে না। সারা শরীরে রক্ত ঝরছে, তবে রানাও মাঝে মধ্যে দু'একটা আঘাত ওর নির্বাচিত লক্ষ্যস্থলে লাগাতে পারল হাতে।

তারপর রানার হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল। ওর একটা কব্জিতে লোহার আঙটার মত কামড় দিল পাইথনের হাত। তবে হাতটা এখন থেঁতলানো ও রক্তাক্ত। একটা আঙুল অস্বাভাবিক বাঁকা হয়ে বাকিগুলোর কাছ থেকে সরে আছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কব্জি মোচড়াল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল। পিছু হটল ও, এবং এই প্রথমবার সঙ্গে সঙ্গে নাগালের বাইরে সরে এল না। শান্ত, সন্ধানী দৃষ্টিতে দৈত্যটার দিকে তাকাল ও।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করল পাইথন। ক্ষতবিক্ষত হাতটা তুলল সে, দেখল। কিছু একটা ঘটল তার মুখে। দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড পর হাসল সে। সিনথেটিক মুখ-ভেঙচানো বলা যায়, কৌতুকে ভরপুর ও চরম আত্মবিশ্বাসে ভরাট হাসি, দীর্ঘ বহু বছর ধরে চর্চা করার ফলে ইচ্ছে করলেই অনায়াসে হাসতে পারে। 'আমার ধারণা,' বলল সে, একটু ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। 'আমার ধারণা, সত্যি বলছি, ড্র করার কৃতিত্ব দেখিয়েছ তুমি।'

রানার সবুট পা সরাসরি তার মুখে আঘাত করল। অন্ধের মত পিছন দিকে হোঁচট খেল পাইথন, গলা থেকে উঠে এল দুর্বোধ পশুর আওয়াজ, শেষ হলো ফোঁপানোর কাছাকাছি একটা শব্দ করে।

দেয়ালের গায়ে নেতিয়ে পড়ল সোহানা। ও বিশ্বাস করে, রানা কোনভাবেই জিততে পারবে না। এমন কি এখনও, যখন এ-ব্যাপারে আর প্রায় কোন সন্দেহই নেই, উল্টোটা বিশ্বাস করতে ওর মন সায় দিল না। পাইথনের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে; তার অস্ত্র, অস্বাভাবিক দীর্ঘ বাহুর শেষ মাথায় হাত দুটো, ভেঙে গেছে।

মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করল সোহানা। আবার চোখ মেলে যা দেখল, নিজেকে মনে হলো হ্যালুসিনেশনের শিকার। প্রকাণ্ড দৈত্যের গোটা কাঠামো শূন্যে খাড়াভাবে ঝুলছে, মাথাটা নিচের দিকে, জমিন থেকে এক গজ ওপরে। ঝুঁকে রয়েছে রানা, সিধে করা একটা মাত্র পায়ে ভর দিয়ে, এক হাতে ধরে রেখেছে পাইথনের মাথাটা।

কি ঘটেছে বুঝতে পারল সোহানা। এটাকে বলা হয় স্প্রিঙ-হিপ থ্রো, অত্যন্ত কঠিন একটা কৌশল। এক পায়ে নিখুঁতভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, একই সঙ্গে স্প্রিঙ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় পা, হাঁটু ভাঁজ করে সামনের ও ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে আঘাত করতে হবে প্রতিপক্ষের পেটে, যাতে তার শরীরের নিচের দিক ও পা-গুলো সবেগে উঠে যায় শূন্যে। পাইথন প্রায় তিনশো পাউণ্ড, তবু কাজটা করতে পেরেছে রানা। করেছেও উল্টোদিক থেকে, পাইথনের পিছনে দাঁড়িয়ে। এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সময় নিয়েছে রানা, আর ঠিক ওই মাহেন্দ্র ক্ষণটিতেই চোখ বুজে ছিল সোহানা।

এই মুহূর্তে, এখনও রানা ছাড়েনি, ভাঁজ করা একটা হাঁটু জমিনে গেড়ে শরীরটা নিচু করল ও, ঠিক যখন পতন ঘটল পাইথনের। পাইথন খাড়াভাবে পড়ল, প্রথমে মাথাটা। পাথুরে জমিন থরথর করে কেঁপে উঠল। আরেকটা কাঁপুনি উঠল জমিন থেকে, গোড়া কাটা গাছের মত ভূপাতিত হলো দানব।

মাটিতে এক হাঁটু গেড়ে স্থির হয়ে থাকল রানা, ফুসফুসে ঝড় তুলছে বাতাস। তারপর, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, প্রতিপক্ষের মৃত্যু। বেশি সময় লাগল না। খুলিটা ভেতর দিকে ডেবে আছে। ভেঙে গেছে ঘাড়। দু'পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, মুখ তুলে তাকাল সোহানার দিকে, দুর্বলভাবে ডান হাতটা একবার নাড়ল।

তারপর, এতক্ষণে, প্রতিক্রিয়া হলো রানার। যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে কাঁপুনি ধরে গেল শরীরে। যা ঘটতে পারত, কিন্তু ঘটেনি, কল্পনা করে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল ওর মন। সামান্য টলছে, রক্তাক্ত বুক ঘন ঘন ফুলে উঠছে, সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে আচ্ছন্নের মত। এর আগে সম্ভবত এভাবে কখনও সোহানার সঙ্গে কথা বলেনি ও, এই সুরে বা এই ভাষায়। 'তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলে, ওভাবে বেরিয়ে এলে যে? ঘরটার ভেতর সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলে তুমি। বেরিয়ে এসেছিলে কি মরার জন্যে? পাইথনকে তুমি চেনো না, জানো না কি করত তোমাকে নিয়ে?' ধলো, রক্ত আর ঘামে ভেজা চুলে আঙুল চালাল রানা। 'তুমি ভালভাবেই জানতে,

মিরাকুলাস কিছু একটা না ঘটলে লোকটার সাথে আমার পারার কথা নয়···ফর গডস সেক, এরকম ঝুঁকি আর কখনও নিয়ো না!'

সোহানার ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা একটা হাসি উঠে এল, কিন্তু দুর্বলতার কারণে আওয়াজটা ফুটল না। নিচের ঠোঁটটা এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ও, চোখ দুটো বন্ধ করল, কুঁচকে থাকল পাতা। তারপরও পানির দুটো ধারা নেমে এল গাল বেয়ে। 'আমাকে বকো না, রানা···,' তারপর আর আওয়াজ বেরুল না।

হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রানা, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সোহানাকে। 'দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত। ইজ। এভরিথিং'স ফাইন।' কান্নার ঝোঁকটা না থামা পর্যন্ত সোহানাকে শক্ত করে ধরে রাখল ও, তারপর দু'হাতের ওপর তুলে নিল শরীরটা। 'চলো, তোমাকে শুইয়ে দিই। চারদিকটা একবার ঘুরে দেখতে হবে। দিনটা আজ আমাদের জন্যে ভাল মনে হচ্ছে।'

পাঁচ মিনিট পর, ঠাণ্ডা কামরায় শুয়ে, ট্রাকের আওয়াজ শুনতে পেল সোহানা, উঠনে এসে ঢুকল। ভেতরে এসে ওর সামনে দাঁড়াল রানা, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'প্রথমে শোনো, ডিনারে আজ কি খাব আমরা,' বলল রানা, বসে পড়ল সোহানার পাশে, ওর একটা হাত তুলে নিল। 'চিকেন সুপ, গ্রীন ভেজিটেবল। টিনের খাবার, তবু। বিস্কিট, চকলেট, ফল, পনির, নারকেল, খই। যা খুশি অর্ডার করো, পেয়ে যাবে। দু'দিনের মধ্যে বাঘের সাথে লড়াই করার শক্তি এসে যাবে তোমার শরীরে।'

রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সোহানা। 'আমি জানতাম—তুমি যখন আছ, সব ব্যবস্থাই হবে।'

'রাখো তোমার ঠাট্টা।' হাসল রানাও। 'এ সবে শুরু। আরও কি কি পেয়েছি শোনো। অস্ত্র, আমাদের কাপড়চোপড় ভরা স্যুটকেস, মেডিকেল-কিট। ত্রিশ গ্যালন পানি, হ্যাভব্যাগ, প্রচুর পেট্রল, তেরপল, কম্বল, স্লিপিংব্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ট্রাকটার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? ওটাই তো আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'শুধু কি ট্রাক? আগে দেখ, তারপর···তারপরও বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। পাঁচ টনী ট্রাক, ছ'টা চাকা। পাঁচ টন, কিন্তু কার্গো ভরা হয়েছে সম্ভবত সাত টনের ওপর, বেশিরভাগই···থাক, নিজের চোখেই দেখবে। ভাল কথা, ট্রাকে একটা ফ্রিজও আছে, ব্যাটারিতে চলে।'

রানার শরীরে চোখ বুলাল সোহানা। 'আগে মেডিকেল-কিটটা নিয়ে এসো, রানা। নিজের যত্ন নাও।'

'শিওর।' দাঁড়াল রানা। 'পাইথনকে সরাতে হবে, তারপর ট্রাকে আর কি আছে দেখব। প্রকাণ্ড আকারের তিনটে কাঠের বাক্স রয়েছে। ভেতরে কি আছে জানি না।'

আবার হেসে উঠল সোহানা, এবার আওয়াজটা ফুটল। 'কি আছে কল্পনা করে নাও।'

'ডোমিটিয়ান মাসের কথা আমি ভুলিনি,' বলল রানা, হাসছে। 'হ্যাঁ, ওগুলোয় সম্ভবত গুপ্তধনই আছে।'

'কিছু কাপড়ও এনো, রানা,' বলল সোহানা। 'আর সাবান। কুয়ার পানিতে গোসল করব আমি। তবে প্রথমে ওষুধ লাগাও গায়ে।'

এক ঘণ্টা পর সোহানাকে পাঁজাকোলা করে কুয়ার কাছে নিয়ে এল রানা। রোদে গরম করা পানিতে ওকে গোসল করিয়ে দিল। অ্যান্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে নতুন করে ব্যান্ডেজ করল ক্ষতটা। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে বেণী করল এক জোড়া। নিজের হাতে কাপড় পরাল। তারপর ফিরিয়ে আনল ঠাণ্ডা কামরাটায়। বলল, 'আগামী দুটো দিন রাক্ষসীর মত খাবে, মরা কাঠের মত ঘুমোবে। তারপর আমরা নিজেদের পথে রওনা হব।' বড় করে নিঃশাস ফেলল রানা, চেহারায় সন্তুষ্টি। 'আমাদের কাজ প্রায় শেষ।'

'প্রায়,' বলল সোহানা, চোখে আদর নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'বাকি শুধু ভিক্টর ক্যানিং-এর সাথে বোঝাপড়া।'

দশ

'আমার ধারণা ছিল আপনারা আরও আগে আসবেন,' বললেন স্যার ভিক্টর ক্যানিং। 'প্রায় এক মাসের মত হতে চলল না!'

মাথা ঝাঁকালেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো, কথা বললেন না। তাঙ্গিয়ার থেকে রানা তাঁকে ফোন করেছে আজ ছাব্বিশ দিন হলো।

ওঁদের নিচে দীর্ঘ খালি সৈকত, চিকচিক করছে। ক্যানেস ও সেন্ট রাফায়েল-র মাঝখানে ছোট্ট একটা খাঁড়ি এটা। ক্যানিং'স বে। পাহাড়ের ঢালু মাথায় ঝুলে আছে লাল টালির ভিলাটা, শান্ত সাগর থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে। গ্রীষ্মের সূর্য প্রখর রোদ ছড়াচ্ছে। তীর্যকভাবে নেমে আসা সিঁড়ির ধাপগুলো চলে গেছে সোজা বোটহাউসের দিকে, পাশেই জেটি।

টেরেসে বসে রয়েছেন ওঁরা, দু'জনের মাঝখানে একটা নিচু টেবিল। মারভিন লংফেলোর পরনে লাইটওয়েট নেভী স্যুট, সাদা শার্ট ও ক্লাব টাই। ভিক্টর ক্যানিং পরে আছেন সাদা টাওয়েলিং বীচ-রোব, আলখেল্লার মত দেখতে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন তিনি। 'এটা কি অফিশিয়াল ভিজিট, মি. লংফেলো?'

মাথা নাড়লেন বিএসএস চীফ। 'অফিশিয়ালি কেউ আপনার কাছে আসবে না। প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর টিমের লোকজন পুলিসকে যা বলেছেন, সে-সব তো খবরের কাগজেই আপনি পড়েছেন। একদল লোক মাস দখল করে নেয়, তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাদের বক্তব্যের অনেকটাই দুর্বোধ্য।'

'হ্যাঁ, দুর্বোধ্য হবারই কথা,' ভিক্টর ক্যানিং একমত হলেন। 'আশরাফ চৌধুরী আর অন্ধ মেয়েটা?'

'তাঁরা কিছু বলেননি। মানে আমাকে ছাড়া আর কি। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন মি. রানা ও মিস. সোহানার ফেরার জন্যে।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে আবার বললেন মারভিন লংফেলো। 'দু'হপ্তা আগে ফিরেছেন ওঁরা।'

ভিক্টর ক্যানিং বললেন, 'আচ্ছা।' সাগরের দিকে তাকিয়ে আছেন, চেহারা দেখে বোঝা গেল না কি ভাবছেন। 'যেভাবেই হোক, কারও চোখে ধরা পড়েননি ওঁরা। পাইথনের কোন খবর জানেন ওঁরা?'

'হ্যাঁ, জানেন। পেনিফিদার আর ব্রুনেলকে খুন করে সে। ধরে নেয়া চলে আপনারই নির্দেশে—পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে। তারপর মাল ভর্তি একটা ট্রাক নিয়ে রওনা হয় সে। কোথায় যাচ্ছিল, আমার কোন ধারণা নেই, তবে আপনি সম্ভবত জানেন। মি. রানা ও মিস. সোহানার সাথে তার দেখা হয়। এই মুহূর্তে সাহারার কোথাও আছে, মাটির তলায়। না, কবরটা চিহ্নিত করা হয়নি—মানে, আমি যতটুকু জানি।'

'আর ট্রাকের মালপত্র?'

'ধরে নেয়া চলে তা-ও মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে। মালপত্রের বিশেষ অংশটুকু আর কি।'

'আচ্ছা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ভিক্টর ক্যানিং। তাঁর চেহারায় তিক্ত পরাজয় বা হতাশার কোন ছাপ নেই। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পাইথনকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। ঠিক কে তাকে···ঠিক কে তার ব্যবস্থা করল?'

'মি. রানা, আমার ধারণা।'

মারভিন লংফেলোর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ভিক্টর ক্যানিং। 'আপনার প্রভাব সম্পর্কে সবই আমি জানি। যে-কোন মুহূর্তে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে পারেন, দশ নাম্বারের দরজা আপনার জন্যে সব সময় খোলা। তারপরও বলছি, আপনি যদি আমার সাথে লাগালাগি করতে চান, আপনাকে হার মানতে হবে। আমার আছে, সংবাদপত্রের ভাষায়, একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপায়ার। এই সাম্রাজ্য আমাকে গোপন অনেক প্রভাব এনে দিয়েছে, আপনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমি। তাছাড়া, আপনার কথা সংশ্লিষ্ট মহলকে বিশ্বাস করানো যাবে বলে মনে হয় না, মি. লংফেলো। কিছু কিছু ব্যাপার কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হয় না।'

'সম্পূর্ণ সত্যি। দীর্ঘকাল ধরে এই বাস্তবতাই আপনাকে শক্তি যুগিয়েছে, আমার ধারণা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার হাতঘড়ি দেখলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'বেলা এগারোটায় সাঁতার কাটা আমার অনেক দিনের পুরানো অভ্যেস। কাজেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে মাফ করার অনুরোধ জানাব আপনাকে। তার আগে দয়া করে বলবেন কি, কেন আপনি এসেছেন?'

কপালে হাত রেখে দূরে তাকালেন মারভিন লংফেলো, সাগরের একটা জাহাজ দেখার চেষ্টা করছেন। দিগন্তের কাছে দুলছে ওটা। 'আগেকার দিনে,' তিনি

বললেন, 'খানিকটা খেয়ালী হলেও, খুবই কাজের ও সিভিলাইজড একটা রীতির চল ছিল। মেসের ফান্ড মেরে দিয়ে ধরা পড়লে বা এ-ধরনের কোন কাজে দায়ী বলে সাব্যস্ত হলে, হাতে একটা রিভলভার ধরিয়ে দিয়ে তাকে বেডরুমে ফিরে যেতে বলা হত। মর্যাদা হারাবার চেয়ে খুলি ফুটো করে সমস্যার সমাধান করার সুযোগ পেত সে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ভিক্টর ক্যানিং। 'আপনার কথাই ঠিক—কাজের, কিন্তু সেকেলে। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, ফাঁস হয়ে যাবার কোন ঝুঁকি আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হতে যাচ্ছে না। পরিস্থিতিটা এমন নয় যে নিজের খুলি ফুটো করে সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাকে। আমি তো কোন সমস্যাই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি পাচ্ছি,' হাসিমুখে বললেন মারভিন লংফেলো। 'আপনি তা না করলে মি. রানা আপনাকে খুন করবেন।'

চোখে কৌতূহল, তাকিয়ে থাকলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'প্রতিশোধ? ঈর্ষা? আক্রোশ? নাকি স্রেফ আত্মরক্ষা?'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'ওগুলোর কোনটাই নয়। তাঁর সাথে এ-ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি আমি। মি. রানা চান না আপনি বেঁচে থাকুন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকলে আপনি আরও অনেক মানুষকে মারবেন। নিরীহ, নিরপেক্ষ মানুষদের। যেমন মেরেছেন ড. জিমসনকে, জুলি উডহাউসকে। যেমন, বাধা দেয়া না হলে, মারতেন প্রফেসর হোয়াইটস্টোন আর তাঁর আর্কিওলজিকাল টিমের সদস্যদের। সেজন্যেই আপনাকে মারতে চান মি. রানা। আপনাকে থামানোর জন্যে।'

কাঁধ দুটো উঁচু করলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট লাগছে আমার কাছে—আমি তো কাউকেই খুন করিনি।'

'সেটা আরও খারাপ।'

'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'আপনি খুন করেছেন প্রক্সির মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কিছু কাজ করানোর জন্যে পাইথনকে আপনি ভাড়া করেছিলেন। তার দ্বারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দিনে দিনে মোটা হয়েছেন আপনি।'

'আমি আরও একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। দেশে আইন আছে। আইনের সাহায্য না চেয়ে আপনার মত একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশী এক লোকের অন্যায় আবদার কেন রক্ষা করতে চাইছেন?'

'আপনার হয়তো জানা নেই, মি. রানার কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে, তিনি একজন ব্রিটিশ নাগরিক। আর আইন যে আপনার কিছু করতে পারবে না, আপনার মত মি. রানাও তা জানেন।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বললেন না ভিক্টর ক্যানিং। তারপর মাথার চুলে হাত চালালেন। 'এ-ধরনের হুমকি রীতিমত অসহ্য। মাথার ওপর এ-ধরনের একটা হুমকি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' গম্ভীর সুরে বললেন মারভিন লংফেলো।

'অবশ্যই আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না। আপনার মি. রানার ব্যবস্থা করার জন্যে এখুনি লোকজনের সাথে যোগাযোগ করব আমি। তার আগে নিজের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখব। লক্ষ রাখব, মি. রানা বা তার সাঙ্গপাঙ্গরা যাতে আমার ত্রিসীমানায় না আসতে পারে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো। 'ওঁর সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা রয়েছে, মি. ক্যানিং। মি. মাসুদ রানা কখনও আপনার মত প্রক্সির সাহায্যে খুন করেন না। কাজটা তিনি নিজেই করবেন। এ-ব্যাপারে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃদু হাসলেন ভিক্টর ক্যানিং। তাকে সাহসের পরিচয় দিতে হবে, সাংঘাতিক ঝুঁকিও নিতে হবে। একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। ভিলার ভেতর কোথাও একটা বেল বাজল। বিশ সেকেন্ড পর সাদা জ্যাকেট পরা এক লোক বেরিয়ে এল টেরেসে। লোকটা দীর্ঘদেহী, কালো। ভিক্টর ক্যানিঙের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে এসে দাঁড়াল সে, সবিনয়ে। 'আমার বিশেষ নাম্বারে ফোন করো—লন্ডন, প্যারিস, জুরিখ, রোম, ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন ও টোকিওতে। সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু করো, পাঁচ মিনিট পরপর। ও, মিচেল, লক্ষ্য রেখো, মি. লংফেলো বিদায় নেয়ার আগে তাঁকে যেন হুইস্কি দেয়া হয়।'

মাথাটা সামান্য কাত করল মিচেল, তারপর মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল। 'মশিয়ে?'

'আ হুইস্কি অ্যান্ড সোডা, প্লীজ।'

নিঃশব্দে চলে গেল মিচেল। ভিক্টর ক্যানিং বললেন, 'আমি লোকজনকে দিয়েই কাজ করাই। কোনটা ভাল, দেখতে পাব আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মি. রানার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।' পরনের বীচ-রোবটা খুলতে শুরু করলেন তিনি। ভেতরে সুইম-স্যুট পরে আছেন।

'আপনি তাহলে রিভলভার হাতে বেডরুমে ঢোকার কথা বিবেচনা করছেন না?' জানতে চাইলেন বিএসএস চীফ। 'মি. রানা কিন্তু ওটাই পছন্দ করতেন।'

ভুরু জোড়া সামান্য কোঁচকালেন ভিক্টর ক্যানিং। 'ভড়ং আমার একেবারেই পছন্দ নয়, মি. লংফেলো, প্লীজ।' রোবটা চেয়ারের পিঠে রাখলেন, হাতঘড়িটা টেবিলের ওপর। 'আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি, বিলিভ মি। গুডবাই।' ঘুরলেন তিনি।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তাঁকে নেমে যেতে দেখলেন মারভিন লংফেলো। জেটিতে পৌঁছে ইতস্তত করলেন না ভিক্টর ক্যানিং, শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন, তারপর ডাইভ দিলেন পানিতে। খানিক পর পানির ওপর মাথা তুললেন, দ্রুত সাঁতার কেটে দূরে সরে যাচ্ছেন। দুশো গজ দূরে পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ছোট একটা দ্বীপ।

ট্রে হাতে ফিরে এল মিচেল, টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। সেদিকে

তাকালেন না মারভিন লংফেলো। ভিলার দিকে ফেরার জন্যে ঘুরল মিচেল, নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে তার পিছু নিলেন তিনি।

ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে থামলেন বিএসএস চীফ। কামরার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল মিচেল।

'আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি,' বললেন মারভিন লংফেলো, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছেন সাগরের দিকে, চেহারায় অন্যমনস্কভাব। 'হুইস্কির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সময় নেই, আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।'

'জে আজ্ঞে, মশিয়ে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল মিচেল, অতিথি বিদায় নেয়ার অপেক্ষায় থাকল।

সৈকত থেকে একশো গজ দূরে দ্রুত, নিয়মিত ছন্দে সাঁতার কাটছেন ভিক্টর ক্যানিং। ছন্দে হঠাৎ করে, মুহূর্তের জন্যে, একটা পতন ঘটল। হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। পানি একটু ছলকালও না, বিনা নোটিসে। নীল সাগরের পিঠ থেকে স্রেফ গায়েব হয়ে গেলেন।

কামরার ভেতর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবার সময় মারভিন লংফেলো বললেন, 'তোমাকে ফোন করার সুযোগ দেয়া উচিত আমার, মিচেল।'

সৈকত থেকে আধ মাইল দূরে, খাঁড়ির পশ্চিম কোণের আড়ালে, ছোট একটা মোটরবোটে বসে বাদাম খাচ্ছে সোহানা। স্থানীয় ইংরেজ জেলে বৌ-এর মত টুটা-ফাটা স্কার্ট ও ব্লাউজ পরেছে ও, হ্যাট দিয়ে মুখটা আড়াল করা। নির্দিষ্ট একটা কোর্সে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে বোটটা। বোটের নিচে, ত্রিশ ফুট রশির শেষ মাথায়, একটা ওয়াটার-প্রুফ লাল ল্যাম্প ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

দশ মিনিট পর গানওয়েলে বাঁধা একটা রশিতে টান পড়ায় ছোট দু'টুকরো কাঠ পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেল। থ্রটল বন্ধ করে চারপাশে তাকাল সোহানা। সাগরে কেউ কোথাও নেই। চোখে বিনকিউলার তুলে কর্কশ পাহাড়ের গায়ের ওপর দৃষ্টি বুলাল, ঢালটা সৈকত থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে।

কেউ লক্ষ করছে না বুঝতে পেরে রশিটায় দু'বার টান দিল সোহানা। দশ সেকেন্ড পর পানির ওপর মাথা তুলল রানা, স্কুবা স্যুটের কালো হুডে চকচক করছে পানি। তাড়াতাড়ি বোটে উঠে স্কুবা স্যুট খুলে ফেলল ও, রশি টেনে তুলে নিল ল্যাম্পটা।

সোহানা জানতে চাইল, 'সব কাজ শেষ?'

উত্তরে ক্ষীণ হাসল রানা। ভিক্টর ক্যানিঙের পা ধরে হিড়হিড় করে নিচে টেনে এনেছিল ও। ধস্তাধস্তির কোন সুযোগ পাননি তিনি, নাগালের বাইরে ছিল রানা। কোন রকম ছটফটও করেননি ভদ্রলোক। রানার ধারণা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফুসফুস পানিতে ভরে গিয়েছিল। লাশটা যদি পাওয়া যায়, শরীরে কোন চিহ্ন থাকবে না—ঠিক যেমন ড. জিমসনের বা জলি উডহাউসের শরীরে কোন চিহ্ন ছিল না।

'সব কাজ শেষ,' বলল রানা। 'চলো, বাড়ি ফিরি, সোহানা। আশরাফ আর জেনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

*

সকালের প্রথম রোদ লেগে ভিলার সাদা পাঁচিল ধবধব করছে। গ্রামের শেষ মাথায় স্থির হয়ে আছে বনভূমি, আজ এখনও বাতাস দেয়নি। দিনটা শুকনো ও ভাল যাবে বলে মনে হলো সোহানার।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও, গা এখনও একটু ভেজা ভেজা। শার্ট ও কর্কশ টুইড স্কার্ট পরল, শার্টের ওপর চড়াল পুরানো একটা জ্যাকেট। খালি পায়ে নিচতলায় নেমে এল ও, কিচেনে ঢুকে কফি বানাল। আশরাফ বা জেনি, কারও ঘুম ভাঙেনি, যে যার কামরায় ঘুমোচ্ছে। কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে টেবিলের ওপর একটা অর্ডন্যান্স ম্যাপের ভাঁজ খুলল ও। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর পেন্সিল দিয়ে একটা রেখা আঁকল ম্যাপে—ভিলা থেকে শুরু হয়ে বিশ মাইল দূরে থামল রেখাটা। বনভূমির ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ, এঁকেবেঁকে চলে গেছে, একবার শুধু একটা তেমাথা পেরুতে হবে।

পথটা মনে গেঁথে নিয়ে কফি শেষ করল সোহানা, তারপর কফি ভর্তি ফ্লাস্ক ও পানির বোতল ভরল একটা লম্বা ব্যাগে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, ভাবল সঙ্গে খাবার নেবে কিনা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ভিলা থেকে বেরিয়ে এল সোহানা। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল, খালি পায়ে হাঁটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

দু'ঘণ্টা পর একটা পাহাড়ের কাঁধের নিচে বসে বিশ্রাম নিল সোহানা, আরও এক কাপ কফি খেল। দুপুরের মধ্যে মাত্র তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা হল ওর—দু'জনকে দেখল দূর থেকে, শেষ লোকটাকে কাছ থেকে। তাকে চিনতে পারল সোহানা, ওদের গ্রামেরই একজন কাঠুরে, কিন্তু মাথায় চওড়া হ্যাট ও পরনে পুরানো কাপড়চোপড় থাকায় লোকটা সম্ভবত ধরে নিল কোন জিপসি হবে। রওনা হবার ছ'ঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছুল সোহানা। সরু একটা নদীর ওপর গাছপালা ঝুঁকে আছে, জঙ্গল ঢাকা ঢাল বেয়ে নেমে গেছে স্রোতটা।

এবার খিদে পেয়েছে সোহানার, তবে খিদে মেটাবার কোন চেষ্টা করল না। নদীর কিনারা থেকে কয়েক ফুট দূরে ঘাসগুলো লম্বা আর শুকনো। কফি খেল ও, ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। একটু পরই ঘুম নেমে এল চোখে।

ঘুম একবার হালকা হলো সোহানার, অস্পষ্টভাবে ধোঁয়ার গন্ধ পেল নাকে, কোথাও যেন ডালপালা পুড়ছে। বুঝতে পারল, ও একা নয়। কটেজে ফেলে আসা ম্যাপটার কথা মনে পড়ল একবার, পুলক ও তৃপ্তির একটা আবেশে শিরশির করে উঠল শরীর, আবার তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

সূর্য তখনও যথেষ্ট গরম, পুরোপুরি ঘুম ভাঙল সোহানার। পাঁচ-সাত গজ দূরে ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে রানা, ওর পাশে ছাইয়ের একটা উঁচু স্তূপ, স্তূপটা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা ফ্লাস্কটা নামিয়ে রানার পাশে এসে বসল। 'চিনতে পারো, আমি সোহানা,' বলল ও। 'কি খেতে দেবে তাড়াতাড়ি দাও, খিদেতে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে।'

একটা লাঠি দিয়ে ছাইটা নাড়ল রানা। ছাই সরে যেতে দেখা গেল, ভেতরে কাদার দুটো বড় বল রয়েছে, ফুটবল আকৃতির। আগুনে পুড়ে বল দুটো শক্ত ও কালো হয়ে গেছে। একটা ছুরি বেরিয়ে এল ওর হাতে। বলল, 'না খেয়ে বলতে পারব না কেমন হয়েছে।'

'জিনিসটা কি?'

'জিপসিদের খাবার, নাম জানি না,' বলল রানা, হাসছে। 'খরগোশের মাংস।'

জবাই করা খরগোশ, তবে ছাল ছাড়ানো হয়নি। কাদার ভেতর পুরো দু'ঘণ্টা পোড়ানো হয়েছে আগুনে। মাটির শক্ত বল ভাঙার সময় শিরদাঁড়া ও চামড়া, দুটোই নিজে থেকে বেরিয়ে আসবে। মাংসটা কচি, গন্ধ পেয়ে জিভে পানি এসে গেল সোহানার।

খাবার সময় গোগ্রাসে খেল, দু'জনেই। কেউ কোন কথা বলল না। কলাপাতা কেটে এনে পরিবেশন করল রানা, পাতার টুকরো হাতে নিয়ে নরম মাংস ছিঁড়তে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। খাওয়া শেষ হতে কফি পরিবেশন করল সোহানা, জানতে চাইল, 'হেঁটে এসেছ নাকি, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কটেজে আজ দুপুরের একটু পর ফিরেছি। ম্যাপটা দেখে সোজা চলে এলাম।' জরুরী কাজে লন্ডনে গিয়েছিল ও, আজই ওর ফেরার কথা ছিল। 'গাড়িটা রেখে এসেছি খানিক দূরে, বিশ মিনিট লাগবে পৌঁছুতে।'

নদী থেকে মুখ ধুয়ে এল সোহানা। 'আশরাফ কি বলছে, শুনবে?'

'কি বলছে?'

'খুবই আড়ষ্ট তার হাবভাব, কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল,' হাসি চাপল সোহানা। 'বলছে, জেনি উডহাউস নাকি জন্মেছেই তার জন্যে, সে-ও জেনি উডহাউসের জন্যে। মস্কোয় ফিরে যাবার আগেই বিয়ে করতে চায় ওরা।'

'শুনে তুমি কি বললে?'

হেসে উঠল সোহানা। 'আমি আবার কি বলব! সে কি আমার পরামর্শ চেয়েছে? বললাম, এরচেয়ে সুখবর আর কিছু হতে পারে না। তোমার কি মনে হয়?'

'আমিও জেনিকে তাই বলেছি,' বলল রানা। 'সে-ও আমাকে ওদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।'

'এখন কি করবে বলে ভাবছ?' জানতে চাইল সোহানা।

'তোমার ছুটি শেষ হলেও কাজ করতে হবে ইউরোপে, কিন্তু বস্ আমাকে ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছেন,' বলল রানা। 'ওদের বিয়েটা দেখেই আমি ফিরে যাব।'

'ভালই হবে, বসের কাছে সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবে তুমি। ভাল কথা, গুপ্তধন বলতে কি কি পেয়েছি আমরা, রানা? মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে মাটিতে পুঁতে রাখার জন্যে ট্রাক নিয়ে একটু দূরে যাচ্ছ। কিন্তু ট্রাক নিয়ে তুমি চলে যাবার আগে বাক্সগুলোয় কি আছে দেখা হয়নি আমার।'

'কি আছে দেখার আগ্রহ তখন খুব একটা ছিল না আমারও,' বলল রানা। 'শুধু একটা বাক্স খুলেছিলাম।' সিধে হয়ে বসল রানাও, পকেটগুলো হাতড়াল। 'তুমি

কথাটা তুলতে মনে পড়ে গেছে। বিল ওয়াটসনকে টাকা দিয়েছ তুমি, কাজেই ভাবলাম ওই টাকার বিনিময়ে এটা তোমার পাওয়া উচিত।' মুঠো করা হাতটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও।

হাত পাতল সোহানা, ওর তালুতে একজোড়া ঝলমলে চুনি পাথর রাখল রানা।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সোহানা, তারপর মূল্যবান রত্ন দুটোর দিকে চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে।

'শুধু এই দুটো এনেছি আমি,' বলল রানা। 'তিনশো গারামান্টাস পাথর থেকে। স্রেফ খরচ তোলার জন্যে। বাকিটা প্রিয় মাতৃভূমির কোষাগারে জমা দেয়া হবে, উপযুক্ত সময়ে।'

মুখ তুলল সোহানা। 'কিন্তু ওয়াটসনকে যে টাকা দিয়েছি তা তো এরই মধ্যে তুলে ফেলেছি আমি।'

'তুলে ফেলেছ? মানে? কিভাবে?'

'তুমি ভিক্টর ক্যানিঙের খবর নেয়ার দু'দিন আগে ক্যানিং হোল্ডিঙের কিছু শেয়ার আমি বিক্রি করে দিই। পঞ্চাশ হাজার শেয়ার। মারা যাবার খবরটা জানাজানি হতেই শতকরা পঁচিশ পার্সেন্ট দাম কমে গেছে।'

হেসে উঠল রানা। 'তাহলে পাথর দুটো নিয়ে কি করব আমরা?'

রানাকে ওগুলো ফিরিয়ে দিল সোহানা। 'দুটো আঙটি তৈরি করতে দাও, ওদের বিয়েতে দু'জনকে উপহার দেয়া যাবে,' প্রস্তাব দিল ও।

'দারুণ প্রস্তাব!' চুনি দুটো পকেটে রেখে দিল রানা। 'এবার তাহলে রওনা হতে পারি আমরা, কি বলো?'

একটু পরই বনভূমিতে গাঢ় ছায়া নেমে এল, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। সরু পথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, রানার একটা হাত ধরে আছে সোহানা, মুখে হাসি।

***